

# পুতুলের সংসার

মিহির আচার্য



উদয় প্রকাশন  
১৩, নরেন্দ্র সেন স্কোয়ার,  
কলিকাতা — ৭০০০০২

প্রকাশক :

উদয় প্রকাশনের পক্ষে

বিষ্ণুপ্রসাদ রায়

১৩, নরেন্দ্র সেন স্কোয়ার

কলিকাতা—৭০০০০২

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ সংস্করণ—১৯৫৩

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

অঙ্কন ছবি : প্রশান্ত দে

প্রাপ্তিস্থান :

হাউস অফ বুকস

৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড

কলিকাতা—৭০০০০২

বুক সাপ্লাই এজেন্সী

১৮ এম, টেমার লেন

কলিকাতা—৭০০০০২

মুদ্রক :

মলয়কুমার দত্ত

মুদ্রালিপি প্রেস

১৮এ, রামনাথ বিশ্বাস লেন

কলিকাতা—৭০০০০২

পুতুলের সংসার	৫
পাকা রঙ	১৪
অভিযোগ	২০
ছেলেটা	২৫
ভালো ছেলের দায়	৩২
দেবতার গ্রাস	৩৮
রক্তের রঙ লাল	৪৩
অগ্নিদিন	৫৭





## পুতুলের সংসার

সময় ঠিক করা ছিল।

ছপুরে আমিনার বাপ মিঞার হাতে তামাক বেচতে যাওয়ার পর, আম্মাজান যখন পুকুরঘাটের পানে নিরুদ্দেশ, সেই সময়ে নিঃশব্দে বাড়ি থেকে পালিয়ে এল আমিনা। এইবার একছুট মহানন্দার ধারে আমগাছের আড়ালে, তাদের পৃথিবীতে। পায়ে ধুলো ওড়াতে ওড়াতে ছুটে চলল সে। সড়কাচা ফ্রকটার আসল রং ধুলোর প্রলেপে আর কিছুতেই চিনতে পারা যায় না। ফোলা-ফাঁপা চুলে ধুলোর বাণিশ।

লক্ষ্মী আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল! তার ফ্রকটার শুধু ধুলোরই চিহ্ন নয়, কোথা থেকে কয়েক প্রস্থ কাদাও লাগিয়েছে।

আমের আঁটিটুকু শেষ বারের মতো চুষতে চুষতে লক্ষ্মী মুখ ভার করে বললে 'ঈশ সই তোব এত দেবি'।

আমিনা কৈফিয়তের সুরে বললে, 'কী করব বল—বাপজান কিছুতেই বেরোতে চায় না।'

'বাপজান!' ঠোঁট উল্টে বড়ো মেয়ের মতো লক্ষ্মী বললে, 'বাবাকে ভয় করিস তুই। তুই না ছেলের মা!'

আমিনাকে বাধ্য হয়েই চূপ করে থাকতে হয়। হায়রে! ছেলের মার স্বাধীনতা কে স্বীকার করলে! এখনো উঠতে বসতে গালিগালাজ, গালিগালাজ ছাড়িয়ে গায়ে হাত তুলতেও তো কেউ ছাড়ে না। আম্মাজান বলে : 'পাড়া বেড়ানো ছেড়ে দিয়ে একটু ঘরের কাজ কর দিকিনি।' ঘরের কাজ তো কতো! তার মানে—সব সময় চোখে-চোখে রাখা, কেবল বড়গিরি ফলানো! কই সেও তো ছেলের মা—জোয়ান জোয়ান ছুটো ছেলে, আজ কি কাল লক্ষ্মীর মেয়ের সংগে বড় ছেলের বিয়ে-শাদি হবে। কিন্তু কখনো সে তার ছেলেদের গায়ে হাত তুলেছে, গালিগালাজ করেছে! কোনো শক্তুরে বলতে পারে এমন কথা!

'নে—অগ্নি ছেলের মার ভাব এসে গেল! এই সই—নে আম ধা—' লক্ষ্মী ঠেলা দিয়ে চেতন করলে আমিনাকে।

আমিনা 'আমটা হাতে নিয়ে লক্ষ্মীর দিকে চাইলে। সেই মুহূর্তে কেমন হিংসে করতে ইচ্ছে করল ওর ওপর। ওর বাপ-মা কতো ভালো! মোটেই শাসন নেই। কী সুখী লক্ষ্মী!

'নে—আম খেয়ে নে। বলে আজ কতো কাজ—' কনে'র মার ভাবনা ছায়া ফেলল লক্ষ্মীর চোখে। 'আজকেই তো একটা জারিখ ঠিক করতে হবে।'

ঝাঁঝী ছপুরের রোদ। মহানন্দার জলে সূর্যরশ্মির ছায়া পড়েছে। ভাঙা-ভাঙা রূপোর সাপের মতো কিলবিল করছে ডেউগুলো। বড়ে বড়ো ঢাকাই নোকো শীরে-লাগা, মালদার আম নিতে এসেছে বোধহয়।

আমগাছের মাথার ওপর থেকে একটা কোকিল ডেকে চলেছে

লক্ষ্মী বললে, 'আমাদের পুরুত কাকা বলেছে দশুই আষাঢ় ভালো দিন আছে।'

আমিনা বললে, 'দশুই! তা আজকে হলো গিয়ে কতো?'

'আজকে তো মাসের প্রথম। তুই কিছু জানিসনে।'

'তাহলে আর কতো দিন পর?'

'ওই তো—একে শূণ্য দশ—দশ থেকে এক বাদ দে—তাহলে ন'দিন.....'

আমিনা ন'দিনের দূরত্বকে হাত বাড়িয়ে ছোঁবার চেষ্টা করলে।

'তোমর বড় ছেলের নাম কী বললি? মজিদ? আমার মেয়ে সরস্বতীর সংগে বেশ মানাবে, না?' ভবিষ্যৎ কল্পনায় স্বপ্নময় হয়ে ওঠে লক্ষ্মীর চোখের ভাষা। এ স্বপ্ন কী আজ নতুন দেখছে সে। কবে—কোন্ ভোর হতে শিলির-ধোয়া শিউলির মিষ্টি গন্ধের মতো এ স্বপ্ন লেগে রয়েছে তার মনে। একটা ছোটখাটো সংসার। ছেলে, ছেলে-বউ। ভালোবাসা। আঃ।

আমিনার বুকেও দোলা লাগে সেই স্বপ্নের। তার চোখ বুজে আসে আরামে।

'বিয়ের পরে কিন্তু ছেলে-বউ আমার কাছে থাকবে ভাই, কেমন?'

লক্ষ্মীর কথাটা আমিনার কানে স্বার্থপরের মতো শোনালে। বড় বেশি বাড়াবাড়ি করছে নাকি সে! এমন কথা তো ভূভারতে শোনেনি সে।

'কা বলিস সই! তা কী করে হয়। বাঃ।'

'কেন?'

'বিয়ের পর তো ছেলে-বউ আমার কাছে থাকবে। তোমর বাপজান বিয়ের পর তোমর আশ্রয়জ্ঞানের বাড়িতে থেকেছে?'

যুক্তি অকাত্য। লক্ষ্মী গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসে। ঠিকই তো বলেছে সই। কিন্তু, বাস্তবের চেহারাটা ভাবতে গিয়েই

চোখ ছলছল করে ওঠে। আচ্ছা—আবার দিদিমাও কী মাকে বিদায় দিতে এমনভাবে কেঁদেছিলেন কোনো দিন! বিয়ের আনন্দে যে মনটা এতোক্ষণ প্রফুল্ল ছিল এবার দ্বিগুণ বিষাদে ভরে উঠল লক্ষ্মীর মন।

‘চল—বাড়ি যাই—’

হুজনে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

কয়েকদিন আর বিজ্ঞানমের ফুরসত নেই ওদের। বিয়ে-শাদির ব্যাপারে কি কম ঝগাট!

‘দিনরাত কী বকবক করছিস তুই? মাথা খারাপ করবি নাকি?’ আমিনার মা গজগজ করতে করতে বলতে লাগল।

আমিনা তার পুরানো ডোরাকাটা শাড়ি ছিঁড়ে ছেলের পোশাক তৈরি করছিল। ঘামে লাল হয়ে উঠেছে ওর কচি মুখখানা। অগোছালো ঝাঁকড়া চুলের রাশি কপালে ছড়িয়ে পড়েছে।

আমিনা হাসলে মায়ের পানে চেয়ে। মাকে তো কোনোদিন ছেলের মা হতে হয়নি। কী বুঝবে আশ্মা? বললে, ‘বারে! দশুই আযাচ যে আমার ছেলের শাদি!’

আশ্মাজ্ঞান মেয়েকে দেখে হাসবে কী কাঁদবে! মার পেট থেকে পড়েই মেয়েগুলো মা হবার স্বপ্ন দেখে! যতো সব বাইরে আজীবনে মেয়েদের সংগে মেলামেশা করবে আর শিখবে বড়ো মেয়েদের আচরণ। তবু…… মেয়েকে কিছুতেই বকতে ইচ্ছে করে না। কোথায় যেন একটা দুর্বলতা রয়েছে মনের কোণে। আহা, সে স্বপ্ন কি সে-ও দেখেনি একদিন।

‘ছেলের শাদি! ছলহানটি কে শুনি?’ নথ ঘুরিয়ে কৌতুকে প্রশ্ন করলে আশ্মা।

‘আমার সই—লক্ষ্মীর মেয়ে সরস্বতী……’

‘অ্যা!’ মেয়ের মূর্খামি দেখে এবার চোখ কপালে ওঠে আশ্মাজ্ঞানের। ‘ছেলেমান্বি বলে কাকে?’

‘কেন ?’

‘ওরা যে হিন্দু ! আমাদের মোসলমানদের সাথে কী হিন্দুর মেয়ের শাদি হয়।’

‘কেন ?’

আম্মাজান যতো সহজ করে ব্যাপারটা বোঝাতে চান, ততো সহজ করে কিছুতেই বুঝতে পারে না আমিনা। পৃথিবীতে এমন কোন্ বাধা আছে যা তাদের ছেলে-মেয়ের শাদি আটকায়। লক্ষ্মীর মেয়ের সাথে তার ছেলের বিয়ের ঠিক হয়েছে কী আজকে ? কতো দিনরাতের টেনে আনা স্বপ্ন-সাধ তাদের !

‘কেন ?’ আমিনার চোখের দৃষ্টি আম্মাজানের ওপর নিবদ্ধ।

‘বললাম যে, ওরা হিন্দু।’ মা গৌসলে চলে যান বাস্তব পায়ে।

আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। সূর্যটা চক্‌চক্‌ করছে।

দাওয়ান ওপর পা ছড়িয়ে বসে রইল আমিনা। রোদে পুড়ে যাচ্ছে তার মুখ। পিটপিট করছে চোখের তারা দুটো। কোলের কাছে ছেলের কামিজ অনাদরে পড়ে রয়েছে।

কী বলে গেল আম্মাজান ? লক্ষ্মী হিঁহু আর সে মোসলমান। তাই বুঝি তার বাপজানের মুখে ছুঁচলো মূর, লক্ষ্মীর বাবার মুখে কিন্তু দাড়ি নাই। তার বাপজান লুঙ্গি পরে, লক্ষ্মীর বাপ পরে না। তাই বুঝি তারা মোসলমান, ওরা হিঁহু।

কিন্তু……লক্ষ্মীর বাপ যদি বাপজানের মতোই দাড়ি রাখে। লুঙ্গি পরে—তাহলে তিনিও তো মোসলমান হয়ে যেতে পারেন। বাপজান দাড়ি কামিয়ে লুঙ্গি ছেড়েও তো হিন্দু হয়ে যেতে পারেন ! হিন্দু মোসলমান তো দুটো নাম কেবল। আসলে পোশাকে-পরিচ্ছদের ফারাক।

ভাঙা আয়নাটা কুড়িয়ে নিয়ে নিজের মুখ দেখে আমিনা। সে তো কিছুতেই বুঝতে পারে না—লক্ষ্মীর সংগে তার তফাত

কোথায়। লক্ষ্মীর নাকটা না হয় তার চেয়ে একটু বেশি টিকলো, গায়ের রংটা না হয় একটু তামাটে, কিন্তু তাতে হয় কি ?

ভাঙা আয়নাটা নাড়তে নাড়তে কখন কড়ে আঙুলটা কেটে গেছে অসাধখানেে। বড়ো বড়ো চোখে চেয়ে রইল আমিনা আঙুলটির দিকে। টপটপ করে রক্ত পড়ছে। লাল জবাফুলের মতো লাল। সেবার পুকুরঘাটে পড়ে গিয়ে লক্ষ্মীর যখন মাথা ফেটে গিয়েছিল, তখনও তো তার এমনি রক্ত পড়েছিল। লাল তাজা জবাফুলের মতো রং।

আমিনা পাথরের মতো বসে রইল।

বিকেলে রোদ মিইয়ে আসতেই আমবাগানে এসে ধুপ করে বসে পড়ল আমিনা। জায়গাটা এতো শাস্ত, এতো নির্জন, আর পারলো না সে, হুঁহু করে কান্নার বানে চোখ-মুখ-বুক ভেসে গেল তার।

লক্ষ্মী এসে বললে, ‘মরণ আর কী! আজ বাদে কাল যার ছেলের বিয়ে সে কেমন কাঁদতে বসেছে ছাখো না।’

আমিনা কাঁদতে কাঁদতে বললে, ‘তোমার মেয়ের সাথে আমার ছেলের শাদি হবে না।’

‘কেন?’ লক্ষ্মীকে কে যেন ছুঁড়ে মারলে অতল খাদে।

‘আম্মাজান বলেছে, তোরা হিঁহু...’

‘হিঁহু! তাতে হয়েছে কি?’

‘বাঃ! আমরা যে মোসলমান—’

‘তাতে কী?’

‘হয় না।’

হুঁহুনে মুখোমুখি। মহানন্দা ধীর গতিতে বয়ে চলেছে। বিকেলের শাস্ত নদী—বিশ্রু, করুণ।

হঠাৎ কক্ষির মতো সোজা উঠে দাঁড়াল লক্ষ্মী। ‘তুই একটু বোস, আমি আসছি—’

ভীর বেগে ছুটে চলল লক্ষ্মী। পায়ের তলে মাটি কাঁপছে তার।  
কেমন এক নাম-না-জানা ভয়ে ছরছর করছে বৃকের ভেতরটা।

বাড়ি।

‘মা, ওমা—’ লক্ষ্মী আছড়ে পড়লো মায়ের বৃকে। তারপর  
বাঁধ-ভাঙা কান্না।

‘কী হয়েছে খুকি, কাঁদছিস কেন?’ মা মেয়েকে জড়িয়ে  
ধরে জিজ্ঞেস করেন।

‘আমিনার মা বলেছে যে আমাদের ছেলে-মেয়ের বিয়ে হতে  
পারে না? আমরা হিন্দু। ওরা মোসলমান……’

মেয়ের আবেগের মাথায় চট করে কোনো কথা জোগায় না  
মায়ের মুখে।

‘আচ্ছা—সে পরে হবেখন। আয়—বোস—খেয়ে নে—’

‘না, আমি খাব না। তুমি বলো আগে।’

‘শোন—কথা শোন খুকি……’

‘না—না……’

‘শোন — আমিনার মা ঠিকই বলেছে খুকি - ওরা যে,  
মোসলমান……’

‘মোসলমান তো কী হয়েছে?’

‘ওরা যে অশু জাত……’

‘জাত কী!’

‘সে তুই বুঝবি নে।’

‘আমি বুঝতে চাইনে—চাইনে—চাইনে। সব তোমাদের  
বড়দের বড়বস্ত্র। কাঁদতে কাঁদতে আমবাগানের দিকে ছুটল লক্ষ্মী।

আমিনা আমবাগানে নেই। সে চলে গেছে। মহানন্দার  
জলে তখন বেলা শেষের সূর্যের সোনা আলো। গেরুয়া ছাপ  
পশ্চিমের মেঘে। সন্ধ্যার ছায়ায় লক্ষ্মীর ছোট দেহখানা অস্পষ্ট  
হয়ে হারিয়ে গেল একসময়।

অনেক রাত্রে কার ঠেলাঠেলিতে ঘুম ভেঙে গেল লক্ষ্মীর।  
চোখ মেলতেই মা'র ভয়-পাওয়া চোখ। 'ওঠ—ওঠ—খুকি—'

'কী হয়েছে মা ?'

দূর থেকে একটা বিরাট হল্লা। চিংকার, কলরব, কোলাহল।

'কই হয়েছে তোমার' বাইরে থেকে বাবার গলা।

'ও খুকি চল—'

লক্ষ্মী ধড়মড়িয়ে উঠে বসলে। কিছু বুঝতে পারে না সে।  
মা কেন কাঁদছে অমন করে। বাবার গলাও ভয়-পাওয়া।

'কোথা যাবে মা ?'

'আমাদের পালিয়ে যেতে হবে এই রাতের অন্ধকারে খুকি।  
এ দেশ নাকি আমাদের নয়। ভাগাভাগি হয়ে গেছে।'

এ দেশ আমাদের নয়! কী বলছে মা পাগলের মতো।  
এই পাহাড়ী মহানন্দা, পথের ধুলো আর আমবাগানের ছায়া  
আমাদের নয়। কী বলে মা যা তা।

'হ্যাঁ খুকি—এ দেশ আমাদের পর হয়ে গেছে। আমরা  
এখন শহরে চলে যাব। ঘাটে নৌকো তৈরি।'

'কই, শিগগির বেরিয়ে পড়ো—মমতা করে লাভ নেই—'  
বাবার গলায় উদ্বেগ।

লক্ষ্মীকে বুকে টেনে নিলেন মা। 'চল—খুকি—'

এক ঝটকায় মার কোল থেকে নেমে পড়ল লক্ষ্মী। 'না, আমি  
যাব না। কিছুতেই না। সব তোমাদের বড়দের চালাকি।'

লক্ষ্মীকে আবার বুকের মধ্যে সাপটে ধরলে মা। 'তুই ছোট  
মেয়ে—বড় হয়ে বুঝবি এসব। চল—'

'না। আমি তোমাদের মত বড় হতে চাইনে। আমি  
ছোট থাকতে চাই। আমি যাব না—কিছুতেই না।'

কী একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেছে আমিনার।

অন্ধকার রাত। কোথাও আলো নেই। সকাল কখন হবে।

কখন ছুটে বাবে সে সইএর কাছে। কমা চাইবে, বলবে, সই, মজিদ আর সরস্বতী কী কোনদিন পর হতে পারে। হিন্দু মুসলমান নিয়ে বড়রা কাজিয়া করুক। আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের বিয়ে শাদি দেবই।

বাতের অন্ধকারে নৌকোখানা নিঃশব্দে ভেসে চলেছে।

লক্ষ্মীর চোখে ঘুম নেই। ‘সই, চুপি চুপি তোকে একটা কথা বলি শোন—আমি আবার ফির আসবই। দশই আষাঢ়ের পরেও ভালো দিন আছে পুরুত কাকা বলেছে।’



একটি পেতলের পিচকিরি কেনার শখ নস্তুর জন্ম থেকে। জন্ম থেকে নয়, যেদিন বুঝতে পারল এই ধুলোকাদা ইট কাঠের বড্ড-সেকেলে পৃথিবীটা একদিন রঙের সাজে মেতে ওঠে সেদিন থেকে। সস্তা দামের টিনের পিচকিরি একটা জোগাড় হয়েছিল, আর আবীর-গোলা ফ্যাকাসে রঙ। মন ভরেনি নস্তুর। কারণ পাশের বাড়ির ডাক্তারের ছেলে কিশোরের হাতে সোনারঙ চকচকে পেতলের পিচকিরিটি সে দেখেছে এবং কয়েক বছর থেকেই দেখে আসছে। রোগা লিকলিকে অহরহ সর্দিতে ভোগা কিশোরের চেয়ে তার শক্ত হাতেই যে ওই সুন্দর পিচকিরিটি ভাল মানায়, তা আর কে না জানে। একদিন দামও জিগোস করে রেখেছিল নস্তুর। আড়াই টাকা মোটে। সেই থেকে পেতলের পিচকিরির ওপর তার দারুণ লোভ।

মার কাছে দরবার করে উত্তর পেয়েছিল, 'কিশোরেরা বড় লোক। ওদের নিজেদের বাড়ি গাড়ি! নস্তুর বাবা মোস্তারেক মুহুরি। মোস্তারবাবু যদি পান ছ'টাকা, মুহুরির বরাদ্দ মাত্র আট আনা।'

মার কথায় পোষ মানে নি নস্ত। ছোট ছেলের মনের রাজ্যে বড়লোক-ছোটলোকের জটিল সমস্যা নেই। কিশোরের থেকে সে আলাদা কিসের? রঙটা ওর হয়তো একটু ফরসা। কিন্তু ওর মতা নিত্য অসুখে ভোগে না নস্ত। এমনও তো হতে পারত কিশোর ও-বাড়িতে না জন্মে এ-বাড়িতে জন্মাতে পারত, আর নস্ত ও বাড়িতে। তা হলেও তো নস্ত নস্ত থাকত, কিশোর কিশোরই। মার ওপর অভিমান হয় তার। বলে, তার চেয়ে বলো না— পেতলের পিচকিরি আমায় কিনে দেবে না! ইচ্ছেটাই বড় কথা। বড়লোক ছোটলোকের কথা আসে কোথেকে? ভারি তো 'আড়াই টাকা দাম। বাবার পাঁচ দিনের রোজগার।

মা নিঃশ্বাস ফেললেন। আর কিছু বললেন না।

কিন্তু দোল তো আর বসে থাকবে না। ছ'দিন পরেই তো রঙের খেলা। টিনের পাতলা পিচকিরিটা ছ'চোখে দেখতে পারে না নস্ত। মরচে ধরেছে। আবার গ্যাকড়া জড়াও। তারপর রঙ যেটুকু উঠবে একটি লোকের শার্টও ভেজানো যাবে না। লোকে হাসে। টিটকিরি কেটে বলে, 'তার চেয়ে আঁজলা করে রঙ নিয়ে ছিটোও খোকা, কাজ হবে।' না। রাগ করে টিনের পিচকিরিটা ছুঁড়ে ফেলল নস্ত। রঙ খেলতে হলে পেতলের পিচকিরি চাই। কিশোর ওদের বাড়ির সামনে বারান্দায় বসে রঙ খেলে। বালতি গোলা রঙ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ওদের বাচ্চা চাকর রামধনিয়া। সে-ই পিচকিরি ভরে দেয়, কিশোর রঙের ফোয়ারা ছোটায়।

দুপুরের আগেই দিন একটি আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল। ইস্কুল থেকে ফেরার পথে বড়োকালীতলার গলিতে টাকা কড়িয়ে পেল

নস্ত। ঠিক আড়াই টাকা। ছটি আস্ত আর আধখানা। বুড়ো কালীমা-ই হয়তো তার দুঃখ দেখে টাকাটা পাইয়ে দিলেন। নস্ত ছুটল দোকানে। পিচকিরি কিনে একবারে বাড়ি ফিরল। না, এখন কাউকে দেখাবে না তার সম্পত্তি—তার মাকেও নয়, বাবাকেও নয়। না কিশোরকে। অবাক করে দিতে হবে সবাইকে।

পিচকিরি কেনার টাকা পাওয়াটা একেবারে অলৌকিক। মা বাবা বিশ্বাস যে করবেন না সেটা নস্ত জানত। পিচকিরির ব্যাপার না হয়ে অল্প কোনো ঘটনা হলে এমন চমকপ্রদ ঘটনাটি লুকোত না সে। তার নিজের মধোই ভয় ছিল, দুর্বলতা ছিল, কেমন নস্তই জানে, টাকা পাওয়ার ব্যাপারটা অগ্নায় হলেও হতে পারে।

দোলের দিন কাক-ডাকা ভোরের শীতার্ভ সকালে বালতিতে রঙ গুলে নিয়ে নতুন কেনা পিচকিরিটি নিয়ে যুদ্ধজয়ের গৌরবে নস্ত যখন সবুগে রাস্তার দিকে প্রস্থান করল, মা তখন সকালের বাসন নিয়ে কলতলায় আর, বাবা দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছিলেন। নস্তর মনে রাখার কথা নয় তারা তখন তার এই পেতলের পিচকিরিটি লক্ষ্য করেছেন কিনা।

বাইরে পৃথিবী তখন চিরদিনের ধূলিধূসর সাজ ছেড়ে রঙের বসন পরেছে। যেদিকে তাকাও রঙ আর রঙ। সে রঙ শুধু জামা-কাপড়েরই নয়, মনেরও। শিশু ও বয়স্কের কলকাকলি আর চিংকারে গাছের ডালে পাখিগুলিরও আজ নিস্তার নেই।

আজ আর লজ্জা নেই নস্তর। কিশোরের হাতের সোনারঙ পিচকিরি আর তার পিচকিরি একাকার হয়ে গেছে। কিশোরের চেয়ে নস্তর আনন্দের সীমা আজ খাটো নয়, কম জোর নয়। আজ আর তার পিচকিরি নিয়ে কেউ ঠাট্টা করবে না। নস্তর মনে হ'ল তার রঙের ফোয়ারা নয়, বিশ্বশুদ্ধ লোক তার পিচকিরির দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। হাতের উপকরণের সঙ্গেই আনন্দের চেহারাটাও যে এমন পালটে যায়, কে জানত।

সকাল গড়িয়ে ফাল্গনের চড়া রোদ চনচনে হয়ে উঠল। আর এখন মজা নেই। রঙও ফুরিয়েছে নস্তুর এ বছরের মতো। খিদেটা এবার চনমনে হয়ে উঠেছে। রঙের নেশার চেয়েও বড় রাক্সুসে খিদে।

বাড়ির কাছেই মহানন্দা। রঙের বালতি আর পিচকিরি বাইরের ঘরের তক্তপোশের নিচে ফেলে রেখে নদীতে ছুটল নস্তুর। আজ আর বড়দের শাসন নেই। সাতখুন মাপ।

ঘাট থেকে ফিরে ভিজ়ে জামা-কাপড় মেঝেয় ডাঁই করে রেখে কোমরে প্যান্টটা এঁটেছে কি না এঁটেছে, চুল বেয়ে জল পড়ছে টস্টস্ করে, নস্তুর ছুটল রান্নাঘরে।

‘মা খেতে দাও, বড় খিদে—শিগ্গির—’

মা রান্নাঘরের দাওয়ায় ঘাড় গুঁজে বসেছিলেন। ছেলেকে দেখে ক্লাস্ত ভঙ্গিতে উঠলেন। বললেন, ‘আয়—’

খালায় নয়, কাঁসার বাটিতে আচারের তেল মেখে পেঁয়াজকুচ ছড়ানো মুড়ি এগিয়ে দিলেন মা।

‘মুড়ি! মুড়ি কেন? ভাত কই?’ উম্মুনে যেন মূনের ছিটে পড়েছে তেমনি আক্রোশ চিৎকার করে উঠল নস্তুর।

মা বললেন, ‘ভাত হয় নি। আজ মুড়িই খা বাবা। বিকলে ভাত দেবো’খন।’

‘না। আমি মুড়ি খাব না। আমার খিদে পায় না বুঝি! মুড়ি খেয়ে পেট ভরে।’

‘তোমার বাবা বাজার করতে পারেন নি। আড়াই টাকা পেয়েছিলেন কাল। রাস্তায় হারিয়ে গেছে।’

আড়াই টাকা! হারিয়ে গেছে রাস্তায়। ছপুরবেলা ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে হঠাৎ আকাশের দিকে তাকালে যেমন রোদে চোখ পিটপিট করে ওঠে। কাঁপন-লাগা গলায় জানতে চাইলে, সে : ‘কোথায়, কোথায় হারিয়েছে টাকাটা?’

মা য়ান হাসলেন ; বললেন, 'তা কি আর উনি টের পেয়েছেন ? বুড়োকালীতলা ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় পড়েছেন, পকেটে হাত দিয়ে দেখেন টাকা নেই। আমারই দোষ, ক'দিন থেকেই বলছিলেন পকেটটা সেনাই করে দিতে.....'

মার কথা কানে যাচ্ছিল না নস্তুর। গত বছরে মহানন্দায় হঠাৎ শ্রোতের প্রবল টানে অর্ধে জলে পড়ে ডুবে যাচ্ছিল সে। সে অনুভূতিটা মনে হচ্ছে। ভয়ে চিৎকার নয়, হঠাৎ বিপদে কেমন আশ্চর্য বিকারহীন বোধহীন হয়ে গিয়েছিল। নস্তুর শুধু ফ্যাল-ফ্যাল করে মার ক্রান্ত বিষণ্ণ মুখের দিকে চেয়ে বোবা হয়ে রইল। ঠিক আড়াই টাকা—কমও নয়, বেশিও নয়। তবে কি বাবার টাকাটাই পেয়েছিল সে। ছুঁর্বাবনাটা ঠেলে ফেলতে গিয়ে যেন আরো ছড়মুড় করে কাদায় গড়িয়ে পড়ল নস্তুর। ঢোক গিলে এখন স্বীকার করল সে : কাল ইস্কুল থেকে ফিরতে ফিরতে মরিয়া হয়ে স্থির করেছিল বাবার পকেট থেকে অন্তত আড়াই টাকা সরাবে সে। ঘেমে নেয়ে উঠল তার সর্বাঙ্গ। একটা অন্ডায় অপরাধবোধ যেন তার হৃদয়কে কুবে কুবে খেতে লাগল। একবার চিৎকার করে অস্বীকার করতে চাইল : আমি চুরি করি নি।

'কী হ'ল ? খাবিনে—' মা জিগ্যোস করলেন মূহু গলায়।

নস্তুর চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। আবছা হয়ে গেল দৃষ্টি। মার শরীরটা যেন আবছা হয়ে হয়ে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। যেন হাত বাড়িয়েও আর মাকে স্পর্শ করতে পারবে না। নিজের একাকিত্বের কথা ভেবে সারা শরীর যেন ছরস্তু শীতে কেঁপে উঠল নস্তুর।

নস্তুর আর পারল না। হঠাৎ মার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণপণে তাঁকে আঁকড়ে ধরে সশব্দে কেঁদে উঠল সে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, 'বিশ্বাস করো মা, আমি বাবার টাকা নিইনি।

‘আমি—আমি কিশোরের মতো পেতলের পিচকিরি কিনেছি। সে।  
টাকা আমি বুড়োকালীতলার কাছেই কুড়িয়ে পেয়েছি। সেই  
আড়াই টাকা বাবার বাজার করার টাকা জানলে আমি কখনোই  
পিচকিরি কিনতাম না।

মাকে সজ্ঞারে জড়িয়ে ধরে ঠোট কামড়ে মনে মনে ঘোষণা  
করল নস্তু : না। আর কোনদিনই এই পৃথিবীটাকে রঙে রঙে  
সাজাবে না। থাক পৃথিবীটা তেমনি ধুলো কাদায় ইটকাঠে।  
রঙহীন পৃথিবীকেই সে ভালোবাসবে।



## অভিযোগ

কলেজ স্ট্রীট আর হারিসন রোডের মোড় পার হয়ে সোজা হাঁটছিলাম, হঠাৎ দিলখুশা কেবিনের সামনে কমলা-দিকে বহুদিন পরে দেখলাম।

এই তো সেই কমলাদি! কত বদলে গেছেন। জীবন-সংগ্রামের ছুরন্ত জন্তুটার নখরাঘাতের চিহ্ন কমলাদির সমস্ত চেহারায়। যৌবন শেষ না-হতেই যেন অকাল বার্ধক্যে কুঁজো হয়ে পড়েছেন।

মহানন্দার আলোছায়াঘেরা তীরে তীরে মালদা শহরের মাটি-আকাশে সেই কৈশোরের ঘন গভীর দিনগুলি। সেই অল্প বয়সেই হেডপণ্ডিতের ছোট ছেলে তপুর চোখে কিশোর-জগৎটা রূপকথাময়

স্বপ্নপুরী হয়ে পড়েছিল। ঠাকুরমার স্বপ্নভরা ঝুলি তখন শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু কিশোর মনের খাচড়া চাই। কৈশোরের স্বপ্নের সঙ্গে বইপড়ার নেশাটা তখন তীব্র। ছোট একটা খাতা ছিল তপুর আর সেই খাতার তহবিলে তখন চোদ্দ পনেরোর মতো পড়া-শেষ করা বইয়ের সঙ্কল জমেছে। তপুর এই বই পড়া খেলার প্রতিদ্বন্দ্বী সাথী ছিল চন্দন। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানের ছেলে চন্দন।

কমলাদিকে প্রথম আবিষ্কারের একমাত্র গৌরব তারই। সে-ই একদিন খবর দিল : 'চল্ যাবি কমলাদির বাসায় - '

'কমলাদি কে ?' বিস্মিত তপু জিজ্ঞেস করেছিল।

চন্দন বলেছিল : 'মুল্লফ সাহেবের মেয়ে। চিনিস না ? সেই যে বালো গার্ল ইস্কুলে পড়ে।'

মহানন্দার ধারে গেট পেরিয়ে সবুজ লন আর মাঝখানে লাল সিঁড়ির মতো সুরকি ঢালা রাস্তা। বাংলো টাইপের দোতারা বাড়ি।

ভয়ে-ভয়ে চন্দনের সঙ্গে এই বাড়িতে এসেছিল তপু। বছর চোদ্দ-পনেরো-র শ্যামলা মেয়ে, ছ'কঁধ বেয়ে বিছুনি ঝুলছে।

কমলাদি'র সংগে আলাপ করিয়ে দিল চন্দন।

কমলাদি হেসে বলেছিলেন : 'পণ্ডিত পড়ুয়া।'

চন্দন সুপারিশ করেছিল : 'এক নম্ববেব বইয়ের পোকা। এরই মধ্যে চোদ্দ-পনেরোটা বই শেষ ক'রে ফেলেছে তপু।'

'তাই নাকি ?' কমলাদি হেসেছিলেন ফের : 'এই এগারো-বারো বছরেই পনেরোখানা। তার মানে, তপু আমাদের বয়সের চেয়েও বেশি বুদ্ধিমান।'

ভাব হয়ে গেল কমলাদির সংগে।

ছুটির দিনে সকালে-বিকালে তপু আর চন্দনকে দেখা গেল কমলাদি'র মুল্লফ-বাবার বড় লাইব্রেরী ঘরটার মধ্যে। আলমারি ভরতি ধরে-ধরে সাজানো বই। ইংরেজি, বাংলা, ফরাসি, গ্রীক,

লাতিন—কিছুই বাদ ছিল না। কিন্তু, তপুদের সব আলমারির বই ছোঁবার অধিকার ছিল না। কমলাদি দক্ষিণের কোণে ছোট স্ন্যাকটা দেখিয়ে দিয়েছিলেন—সেখানে ষত রাজ্যের ছেলেদের বই। দক্ষিণারঞ্জন, অবনীঠাকুর, সুকুমার রায়, রবীন্দ্রনাথ—আরো কত যে বই-এর ঠালাঠেলি।

এক-একদিন ছ'খানা তিনখানা ক'রে বই রুদ্ধনিঃশ্বাসে শেষ করে ফেলত তপু।

চন্দনকে দেখত কোনোরকমে একখানা বই নিয়েই সোফার বুকে এপাশ ওপাশ করছে সে। তারপর বইটাকে উলটে রেখে অনিদিষ্ট ভাবে ঘরময় পায়চারি করত চন্দন। চোখ থাকত তার আলমারিগুলিতে—যে বইগুলো তপুদের বিশেষ ক'রে নিষিদ্ধ ছিল।

সেদিন রবিবারে অবিগুস্ত বইগুলো সাজিয়ে তুলে, আলমারির কাঁচগুলো মুছতে এসে কমলাদি আবিষ্কার করলেন ফরাসী চিত্রকরদের এ্যালবামটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

হন্ হন্ ক'রে তপুদের দিকে এগিয়ে গেলেন কমলাদি।

'তপু'—চোখে ভৎসনা কমলাদি'র।

'কী বলছ কমলাদি'—কিশোর চোখে জিজ্ঞাসা করেছিল তপু।

কমলাদি তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'ফরাসী ছবির বইটা তুমি নিয়ে গেছ ?'

চমকে উঠেছিল তপু। লজ্জায় শরমে মাটির সংগে মিশে যেতে চেয়েছিল সেদিন। লজ্জার চেয়ে অভিমানটাই সেদিন বেশি হয়েছিল। কমলাদি তপনকে এত ছোট ভাবলেন কি করে! সন্দেহ যদি হয়ে থাকে পাশে-বসা চন্দনকেও তো জিজ্ঞাসা করতে পারতেন!

আর সবচেয়ে আশ্চর্য, পরদিন সকালে চাকর ঘর ঝাঁট দিতে এসে গালিচার নীচে ধুলোর তলায় বইটা খুঁজে পেল। পরে জেনেছিলাম, বইটা আলমারি থেকে কে নামিয়েছিল। কিন্তু তার

নাম করে নি তপু। ঘরে ছ'জন আসা-যাওয়া করলেও যখন একজনের 'পরেই সন্দেহটা উঁকি মারে — তখন প্রতিবাদ করা বৃথা।

এই ঘটনাটা মুছে যাবার পর যে ঘটনাটা তপূর জীবনে কলংকের দাগ বয়ে এনেছিল, সেটাই মনে পড়ছে।

পুঞ্জোর ছুটিতে লাইব্রেরী ঘরের টেবিল থেকে মুল্লফ সাহেবের রুপোর ছাইদানিটা চুরি গেল।

আর যথানিয়মেই সন্দেহটা এসে পড়ল তপূর ওপরে। অথচ চুরির কথা মোটেও জানত না সে। এমন কি, কোনোদিন লক্ষ্য করেও দেখে নি ও ঘরে রুপোর একটা ছাইদানি আছে।

কমলাদি'র চোখে মুখে কী তীব্র ঘৃণা!

'ছি ছি তপু! গরিব বলেই কি চোর হতে হবে।'

বেদনায় বিহ্বলতায় ফ্যালফ্যাল করে কমলাদির দিকে তাকিয়ে মুক হয়ে ছিল তপু। সেই কিশোর বয়স থেকে প্রশ্নটা তাকে বার বার পীড়ন করত। কমলাদি কি করে ভেবে নিলেন গরিবের সংগে চোরের একটি নিয়ম মারফিক সম্পর্ক আছে। বড়লোকেবাও তো চুরি করতে পারে—একথা কেন একবার ভাবেন নি কমলাদি—নিজে বড়লোক বলে?

কাল্লা চাপতে-চাপতে সেদিন শেষবারের মতো বেরিয়ে এসেছিল ওদের বাড়ি থেকে তপু।

কয়েকদিন পরে চন্দনই ডেকে নিয়ে গিয়েছিল একদিন ওদের বাসায়। ওর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল চন্দন। তারপর বড়দের মতো চোখ টিপে বলেছিল: 'তোকে একটা মজার জিনিস দেখাবো।'

বাবার কেস থেকে চুরি-করা একটা সিগারেট বের করে দেশলাই জ্বলে ধোঁয়া গিলবার কসরৎ দেখিয়েছিল চন্দন। কিন্তু ভাতে তপু আশ্চর্য হয় নি। আশ্চর্য হয়েছিল তখন, যখন

কমলাদি'র বাবার রূপোর ছাইদানিটা বের করে টোকা দিয়ে সিগারেটের ছাই ঝেড়েছিল চন্দন।

‘তুমি—তুমি চুরি করেছ এটা?’

‘কেন? বলে দিবি বুঝি?’ তাচ্ছিল্যের চঙে বলেছিল চন্দন : ‘যা যা বলগে। কিন্তু কাকে বিশ্বাস করবে কমলাদি—তোকে না আমাকে?’

তপু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সত্যিই তো, কাকে বিশ্বাস করাতে যাবে সে। কমলাদি তো আগে-ভাগেই জানেন : গরিবেরাই চোর। চুরি না করেই তো চোরের বদনাম পেয়েছে তপু, চুরি করে নি বলে নতুন করে প্রমাণ করতে যাওয়া বৃথা!

আজ বহুদিন পর কমলাদিকে দেখে কৌতূহল হল তপুর। এক বার গিয়ে কি জিজ্ঞেস করবে ঠেকে : আজকেও কি তাঁর বিশ্বাস গরিবেরাই চুরি করে।

কিন্তু এগোতে গিয়ে দেখলাম বয়সের ঢেউ ভেঙে আর পেছন ফেরা যায় না। কমলাদি কখন হাওড়ার বাসটায় উধাও হয়ে গেছেন।



# ছেলেটা



পাঁচ বছরের ছেলেটা হঠাৎ কেমন হয়ে গেল। চূপচাপ অঙ্ককার বারান্দার এক ধারে বসে থাকে—কোনো কথা বলে না। নাওয়ার সময় খাওয়ার সময় কোনো খেলা নেই—না সাড়া না শব্দ। জোর করে ধরে চান করাও, খাইয়ে দাও, মুখ ধুইয়ে দাও। তারপর আবার চূপচাপ নিঝুম অঙ্ককার বারান্দার কোণে বসে থাকা।

অথচ সেদিন পর্যন্ত ছোটোছোটো করে ছেলে, হেসেছে, খেলেছে। ৬র দাপটে বাড়ি অস্থির। বাবার টেবিল থেকে কাগজ বের করে বাবা হয়ে বাবার মতো লিখেছে, গালে হাত দিয়ে বই পড়েছে, বাবার চশমা পরে বাবা সেজেছে। আজ আর সে সব প্রিয় কাজের দিকে তার নজর নেই, অথচ বাবার টেবিলে এখনো

লেখার কাগজ জমে রয়েছে, এখনো অনেক বই, এমন কি চশমাটা পর্যন্ত। নেই কেবল বাবা নামক মানুষটি। এই তো ছুটো হুণ্ডা হল তিনি কয়েকদিনের অশুখে ভুগে মারা গেছেন।

বাবা মারা গেলেন বিকেলে। তখনো আকাশে অনেক রোদ, আলো। উঠানের মস্ত নিমগাছের ছায়ায় বসে তীরধনুক বানাতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছিল ছেলেটা।

মোক্ষদা ঝি এসে বললে, ‘খোকাবাবু, বাড়ি এস। তোমার বাবা এইমাত্র মারা গেলেন।’

ছেলেটা বেশ খানিকক্ষণ কেমন হয়ে গিয়েছিল। তারপর সজোরে মাথা ঝাঁকিয়ে প্রতিবাদ করেছিল, ‘যাঃ!’

ঝি বোঝাতে চেয়েছিল, বোধ হয় তার বুদ্ধিমত্তা কিছু তত্বকথাও আউড়েছিল। কিন্তু ছেলেটা বোঝে নি, বিশ্বাস করে নি। বাবার মৃত্যুর মতো অসম্ভব ঘটনা তার অভিজ্ঞতার সীমার মধ্যে নেই। সে বলেছিল, ‘তোমার কেবল মিছে কথা। যা—চলে যা। নইলে মাকে ডাকব।’

ঝি বলেছিল, ‘মা-ই তোমাকে ডাকতে পাঠিয়েছেন। চলো। এই সময়ে বাবার কাছে থাকতে হয়।’

তীরধনুক হাতে উঠে দাঁড়িয়েছিল ছেলেটা। ঝিয়ের সঙ্গে আসছিল বাড়ির মধ্যে। বাবার শোবার ঘরের দরজায় পা দিতেই থমকে দাঁড়িয়েছিল সে। ভেতরটা কেমন অন্ধকার, আর ঘরের মানুষগুলোকে কেমন ছায়া-ছায়া দেখাচ্ছিল। আর, সমস্ত পরিবেশটা বোঝাধরা। উঁকি মেরে দেখেছিল ছেলেটা। বাবার বিছানার পায়ে দিকে নিখর নিস্পন্দ মায়ের উপস্থিতি; তারপর আর কিছু দেখতে পারে নি, কেমন ভয়-পাওয়া ক্ষুদ্র প্রাণীর মতো ঝিকে ঠেলে দিয়ে ছুটে পালিয়েছিল সে। উঠোন পেরিয়ে, বাড়ি থেকে দূরে, রেল লাইনের ধারে অজগরের মতো ধাবমান এক জোড়া লাইনের দিকে চেয়ে স্থির হয়ে ছিল ছেলেটা। দিগন্তে

নেমে-আসা আকাশকে ফুঁড়ে কতদূর গেছে এই লাইন। অনেকক্ষণ ওই ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল সে। কেউ তার খোঁজে আসে নি। সন্ধ্যার অনেক পরে ধীর পায়ে বাড়ি ফিরেছিল ছেলেটা। কেউ তার কৈফিয়ত চায় নি। সমস্ত বাড়িটা আধো নিবুম। খিদে পেয়েছিল, কেউ তার খবর নেয় নি। ছেলেটা সরে গিয়েছিল ঘরের অন্ধকার কোণে, চূপচাপ হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসেছিল। তারপর খিদেয় ক্লাস্তিতে এবং অভিমানে এক সময় ঠাণ্ডা মেঝের ওপর ঘুমিয়ে পড়েছিল।

পরের দিন থেকেই ছেলেটা কেমন হয়ে গেল। না খেলা-ধুলো, না সাড়াশব্দ। চূপচাপ কেবল অন্ধকার গায়ে জড়িয়ে বারান্দার কোণে বসে থাকা।

মা তাঁর জীবনের অপূরণীয় ক্ষতি ধীরে ধীরে মেনে নিয়ে একমাত্র ছেলেকেই আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ছেলেটাও হয়েছে তেমন। দূর থেকে মাকে আসতে দেখলেই পায়ে পায়ে পিছোয়, তারপর ছুটে নাগালের বাইরে চলে যায়। মাকে যেন সহ্য করতে পারে না সে। মাকে দেখলে ওর কুশ শীর্ণ মুখের ওপর চোখ জোড়া কেমন বদলে যায়, চোখের লাল শিরা বড় বেশি ফুলে ওঠে। যেদিন পালাতে পারত না, মা আঁকড়ে ধরতেন তাকে, আদর করতেন। কিন্তু ছেলেটা মা'র বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার জন্য ছটফট করত, দুর্বল শরীরে তখন অসম্ভব শক্তির জোয়ার আসত, আঙুলের নখগুলি ধারালো হয়ে উঠত। তারপর একসময় ক্লাস্ত হয়ে পড়লে সমস্ত শরীর কাঠের মতো শক্ত হয়ে যেত, দাঁতে দাঁত এঁটে চূপ করে পড়ে থাকত। মা'র বুক উজাড় করা স্নেহের তোড়ও তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারত না।

সেদিন রাত্রে ঘটনা মাকে আতংকিত করে তুলল।

মোকদ্দা বি রাতের কাজ সেরে চলে যাবার পর তাড়াতাড়ি

শোবার ব্যবস্থা করেছিলেন মা। ছেলেটাকে বিছানায় জোর করে তুলে দিয়েছিলেন। তারপর এক সময় ঘুমিয়েও পড়েছিল সে। রাত্রির নির্জনতায় একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে মাও কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

তারপর হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে যাবার মতো অস্বস্তিকর অবস্থায় মধ্যে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লেন মা। ঘরের আবছা আলোতে দৃশ্যটা দেখে ভয়ানক চিৎকার করে উঠলেন তিনি। তাঁর বুকের দিকে বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে ছেলেটা, খালি গা, দরদর করে ঘামছে, চোখ দুটো জ্বলছে ধিক-ধিক, আর ওর হাতে রুটি কাটার ধারালো ছুরিটা হিংস্রভাবে উঁচিয়ে রয়েছে।

হাত থেকে ছুরিটা কেড়ে নিলেন মা। জিজ্ঞেস করলেন, ‘কি, কি হয়েছে?’

ছেলেটা ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। অঙ্ককারে ঘুরছিল ওর চোখের তারা। বিড় বিড় করে কি বকছিল সে।

মা’র সেদিন সারারাত চোখে ঘুম নেই।

এর পর মা আর নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না। টেলিগ্রাম পাঠালেন দাদার কাছে।

খোকনের মামাবাবু আসতে দেরি করলেন না। সব শুনলেন, দেখলেনও নিজের চোখে তেমনি নিরুন্ম চুপচাপ জড় পদার্থের মতো ছেলেটাকে। মামাবাবুর কোনো জেরারও উত্তর দিল না। মামাবাবুর শৈর্ষ হার মানল। অবাক হলেন ভদ্রলোক : ওই এক ফোঁটা ছেলে দিনের পর দিন কথা না বলে মুখ বুজে থাকে কি করে!

হাল ছেড়ে দেবার আগে মামাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ‘যাবে আমার সঙ্গে—আমাদের বাড়িতে?’

কী আশ্চর্য, ছেলেটা এবার বড় বড় চোখ তুলে তাকাল মামাবাবুর মুখের দিকে এবং ঘাড় নাড়ল।

পরদিন ছেলেটা রওনা হয়ে গেল মামাবাবুর সঙ্গে।

এবাড়িতে ছেলেমেয়েদের হাট। ঠরই বয়সী, কিংবা ছু'এক বছরের বড় সব মামাতো ভাইবোন। কেউ হাত ধরে টানে, কেউ ঝাঁপিয়ে পড়ে গায়ে। ছেলেটা হঠাৎ নিস্তরঙ্গ পুকুর থেকে যেন সমুদ্রে এসে পড়ল। মনে হল সে তার অটুট গাঙ্গীর্ষ নিশ্চুপতা নিয়ে আর থাকতে পারবে না। ওদের হাত আলগা, করে চোখ এড়িয়ে যে কোথাও নিরাপদে চুপচাপ বসে থাকবে, তার উপায় নেই। ওরা ঠিক খুঁজে বার করবেই। মুখ বন্ধ রেখে পার পাবার যো নেই। ছেলেটাকে ছু'একটা কথা বলতে হয়, বলতে কষ্ট হয়, তবুও বলে। ওরা বাগানে ধরে নিয়ে যায় খেলতে। ছেলেটা দাঁড়িয়ে থাকে। পেছন থেকে কেউ ঠেলা মারে, কেউ চোখ টিপে ধরে। খোকন পালাতে যায়। ওরা গোল হয়ে হাতের শেকলের মধ্যে তাকে আটকে ফেলে।

ছোট্ট বোনটি একদিন জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোনো খেলা জানো না?'

ছেলেটা ঘাড় নাড়ল, বললে, 'জানি।'

'কি খেলা, কি খেলা?' একসঙ্গে শিশুকণ্ঠ কল-কল করে উঠল।

ছেলেটা বললে, 'ডাক্তার-ডাক্তার...'

'সে আবার কি খেলা?'

ছেলেটা খেলা বুঝিয়ে দিল।

সেদিন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল বলে খেলার চালটা আর কাজে প্রয়োগ করতে পারল না ওরা।

পরদিন নতুনের মোহেই ওই খেলাটা খেলল ওরা। মামাতো ভায়েদের মধ্যে বড়জন হল বাবা, খুকুমণি হল মা, আর ছেলেটা নিজে ডাক্তারবাবু। ঘাসের শষায় বাবা গুয়ে রোগের যত্নশায়

কাতরাতে লাগল, মা পাশে বসে। ডাক্তার এল। রোগীকে দেখল ভালো করে। তারপর কোথা থেকে একটা কফির আগা জোগাড় করেছিল ডাক্তার, তাই দিয়ে এমনভাবে রোগীর বুকটা পরীক্ষা করতে লাগল যে রোগী যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল।

রোগী ধড়ফড় করে ধুলো ঝেড়ে উঠে পড়ে বললে, 'বারে, আমার লাগে না বুঝি?'

'বাঃ, অসুখ হয়েছে, লাগবে না?' ডাক্তার বললে।

'তাই বলে সত্যি সত্যি—?'

'বাঃ, তোমার অসুখটা যে বাড়াবাড়ি—' ডাক্তার বললে, 'তোমাকে মরে যেতে হবে যে।'

'ছাই, ছাই খেলা।' মুখ ব্যাজার করে বললে মামাতো ভাই, 'একদম বাজে। বিচ্ছিরি।'

ছেলেটার সমস্ত চেহারা কি রকম অস্বাভাবিক হয়ে উঠছিল! চোখের তারা দুটো কেমন ঘোলাটে, লাল শিরা ঠেলে ওঠা। ঝিড় ঝিড় করে বললে, 'বাবা মরবে না?'

'কেন? কেন মরবে বাবা?' মামাতো ভাই তখনো ফুঁসছে, 'তোমার, তোমার বাবা মরেছে। তাই বলে—'

কথা শেষ হল না, তার আগেই ছেলেটা কেমন বদখত গলায় চিৎকার করে উঠল, চোখমুখ কালো, ঠোঁট দুটো কাঁপছে। তারপর সমস্ত শরীরে দামাল শক্তির জোয়ার এল তার। এক লহমায় কাঁপিয়ে পড়ল মামাতো ভায়ের উপর, সহ্য করতে না পেরে ছড়মুড় করে পড়ে গেল মামাতো ভাই। তার ওপর চেপে বসেছে ছেলেটা। কাঠিটা দিয়ে বারবার খোঁচাতে লাগল তাকে, ভূতুড়ে গলায় বার বার চিৎকার করে উঠল, 'তোকে মরতে হবে মরতেই হবে তোকে।'

ওর প্রচণ্ড অত্যাচারের দাপটে ছটফট করছে মামাতো ভাই, সমস্ত শরীর কঁতবিকঁত।

অন্য ভাইবোনেরা ভয় পেয়ে ছুটল বাড়ির দিকে।

পরক্ষণে মামাবাবু, মামীমা ছুটে এলেন।

‘ছেড়ে দে—ছেড়ে দে ওকে—’ মামাবাবু ছাড়াবার চেষ্টা করলেন ছেলেকে।

‘না। ওকে মরতে হবে। ও বাঁচবে না কিছুতেই!’—রাগসে গলায় তখনো চিৎকার করছে ছেলেটা।

মামাবাবু জোর করে ছাড়িয়ে নিলেন ওকে। সমস্ত শরীর কাঁপছে ওর, দরদর করে ঘাম বইছে শরীরে, চোখ লাল, স্টোটার কোণে ফেনা জমে উঠেছে! এতক্ষণ ধরে উত্তেজনার পর সস্থ করতে না পেরে পড়ে যাচ্ছিল ছেলেটা। মামাবাবু ওকে ধরে ফেললেন। কোলে করে বাড়িতে নিয়ে এলেন।

তারপর থেকেই ছেলেটা যেন কেমন হয়ে গেল। কারো সঙ্গেই মেশে না, কারো সঙ্গেই কথা বলে না। চোখ দুটো বড় বড় করে কেবল তাকায়। মাঝে মাঝে আপন মনে বিড়-বিড় করে কি জানি বলে আর মুচকি মুচকি হাসে।



## ভালো ছেলের দায়

পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে সব চেয়ে ছোট বলেই নয়—সুকুমার লেখাপড়ায় আচার-ব্যবহারে এত ভালো ছেলে যে শুধু বাড়ির লোকেরাই নয়—পাড়াশুদ্ধ লোকে বলেন যে, সে আদর্শ ছেলে। ইন্ফ্যান্ট ক্লাস থেকে যেবার ডবল প্রমোশন পেয়ে ক্লাস থ্রি টপকে এল সেইদিন থেকেই বোঝা গিয়েছিল এ ছেলে কপালে জয়ের টীকা নিয়েই জন্মেছে। তারপর এক-এক করে ফার্স্ট ক্লাসে উঠে টেস্ট দিয়ে এ বছর সে ফাইনালের জন্মে তৈরি। প্রতি বছর ক্লাসে এত রাশি রাশি প্রাইজের বই পেয়েছে যার জন্মে আলাদা বুক-শেল্ফেরই অর্ডার দিতে হয়েছে সুকুমারের বাবাকে।

চুলে চিরুনি পড়েছে, কিন্তু ব্যাকব্রাশ করতে শেখে নি। মূহু লয়ে কথা বলে, চোখ তুলে চায় না। মোটামুটি ভালো স্বাস্থ্য। কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে পাড়া দিয়ে যখন নিঃসঙ্গ হেঁটে যায় সে,

গুরুজনেরা ওর দিকে আঙুল উচিয়ে নিজের নিজের ছেলেদেব মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন : 'ওই ছাখ সুকুমার যাচ্ছে। প্যারিস ওর মতো গুড বয় হতে? কোন্ ভোরে ওঠে, পড়াশুনোয় এমন মনোযোগ। ক্ষয়ে ছোটো হয়ে গেলেও একটি পেনসিলও ওর হারায় নি।'

হেডমাস্টার থেকে সেকেণ্ড পণ্ডিত পর্যন্ত, মায় দপ্তরীদের কাছেও সুকুমার আদরের। ক্লাসে মাস্টারমশায়ের অবর্তমানে গোলমাল হলে মাস্টারমশায় সুকুমারকে সাক্ষী মানেন। ইনস্পেক্টার ইস্কুল দর্শনে এলে সুকুমারকেই প্রতিনিধিত্ব করতে হয়।

ভালো ভালো ভালো—জ্ঞান হওয়ার পর থেকে ইস্কুলজীবনে যুক্ত হবামাত্রই তার কানে আশেপাশে থেকে এই একটি মন্ত্রই উচ্চারিত হয়েছে।

সুকুমারও বিশ্বাস করে ফেলেছে সে সত্যিই ভালো ছেলে— আদর্শ ছেলে। কাজেই ভালো না হয়ে উপায় নেই তার। সংসারে এত লোকের বিশ্বাস গচ্ছিত ধনের মতো সে যেন আগলে রেখেছে, কোনো মুহূর্তে ভঙ্গ হলে বিরাট আকারের রাহাজানি হয়ে যাবে।

রাত জেগে পরীক্ষার পড়া করতে-করতে ঘুম পায়, চোখ জ্বালা করে। সমস্ত বাড়ি ঘুমে অজ্ঞান, সুকুমারের ঘুমোবার উপায় নেই; চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে আবার টেবিলে মাথা গুঁজে বসতে হয়। সে ভালো ছেলে, ভালো ছেলেদের পরীক্ষার সময়ে ঘুমোতে নেই খালি খালি।

মাথা দপ্‌দপ্ করে, গা-জোড়া ক্লান্তি। কুশ রুক্ষ হয়ে ওঠে সারা মুখের চেহারা। মনে হয় ক্রমাগত দুই হাত প্রসারিত করে ইলাস্টিকের দড়ি টানছে আর টানছে। এক সময়, কে জানে, মনে হচ্ছে দড়িটা ছিঁড়ে যাবে। প্রকৃত ছিঁড়ে গেলেও টানাটানির অধ্যবসায় থেকে নিস্তার পেরে।

ইলাস্টিকের দড়িটা যদি কাঁদতে পারত! ঘোরঘোর লাগে মাথাটা। না কাঁদবে না দড়িটা। ইলাস্টিকের ধর্মই শুধু বেড়ে যাওয়া—যেমন তার ধর্ম ভালো, আরো ভালো হওয়া।

কিন্তু, কী হয় ভালো না হয়ে? ওই তো গলির ওমোড় থেকে মুখের মাঠের ছেলেদের চিংকার ভেসে আসছে। এখুনি যদি বেড়িয়ে আসতে পারে মহানন্দার বাঁধের ওপর দিয়ে—সন্ধ্যার লাল আবীরে নদীর জল রাঙা হয়ে উঠেছে, মাছরাঙা আর তিত্তিরপাখির হাওয়ায় লুটোপুটি খাচ্ছে, আকাশ মুহুমূহু রঙ বদলাচ্ছে, হোলির দিনের রঙ। যদি ছুটে যাই সেখানে, যেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের মাথার ওপরে দেওদার গাছের সারি, চাঁদ উঠবে—হলুদবর্ণের চাঁদ। ..

কিন্তু, শক্তি নেই তার। এক মোহিনী মন্ত্র যেন তাকে ঘরবন্দী করেছে। বেরোতে পারলেও সত্যিকার বাইরেকে পাবে না। একটা নিশ্বাস ফেলল সুকুমার।

বাবার কড়া নিষেধ—সুকুমারের পড়ার ঘরে কেউ যেতে পারবে না। ঘর হতে একটু বেরিয়েছে কি, মা হাঁ হাঁ করে ছুটে এসেছেন : 'পরীক্ষার সময়ে একটুও অমনোযোগী হতে নেই। যা, যা পড় গিয়ে--'

তুমি ভালো ছেলে—তুমি ভালো ছেলে--চার দেয়াল জুড়ে কারা ফিস্‌ফিস্ করে বলে চলেছে। যেন পাখির হাল্কা পালক দিয়ে সুড়সুড় দিচ্ছে; ঘুম নয়, ঘুম-ঘুম আচ্ছন্ন ভাব জড়িয়ে ধরে তাকে। ভালো লাগে, তবু ভালো লাগে।

পরীক্ষা এল। প্রথম কয়েকটা দিন ভালোই হল।

ভূগোলের দিন হঠাৎ প্রশ্নপত্র হাতে নিয়ে কেমন জড়ভরত হয়ে গেল সুকুমার। মাথাটা কেমন ভোঁতা-ভোঁতা, আর চোখের সামনে সব কিছু ধোঁয়া-ধোঁয়া। কপালের পাশের শিরাছটো

দ্বন্দ্ব করছে। কাঁপুনি নয়, শরীরের রক্ত যেন ঘাম হয়ে ফেটে পড়তে চাইছে। প্রশ্নপত্র হাতে নিয়ে পাথরের মতো নিশ্চল নিস্পন্দ। কী আশ্চর্য! একটি প্রশ্নের উত্তরও মনে আসছে না। অথচ, কাল রাত জেগে চেনা প্রশ্নগুলিই কণ্ঠস্থ করেছে। একটুও মনে আসছে না—একটাও না।

আশেপাশে ছাত্ররা ষাড় গুঁজে লিখতে বসেছে। একঘেয়ে কলমের শব্দ। তরঙ্গক্ষুর সমুদ্রের মধ্যে তার নিখর দ্বীপের উপস্থিতি। সে শুধু একা বসে। সুকুমার— ভালো ছেলে সুকুমার।

এ কী হল! ইলাস্টিকের দড়িটা টানাটানি করতে করতে এবার কী...

ভালো ছেলে—ভালো ছেলে—ভালো ছেলে—কানের পর্দায় হাজার হাজার ভোমরা যেন ব্যাজব্যাজ শুরু করেছে! নাকি ব্যাগপাইপ বাজাচ্ছে কেউ!

একটা উন্নত কোলাহল। মিউনিসিপ্যালিটির রোড লেভেলার বিকট শব্দে গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে।

হঠাৎ যেন ছরস্তু শীতে সারা শরীর ঠকঠক করে কেঁপে উঠল সুকুমারের। গলার ভেতরটা শুকনো কাগজের মতো খসখসে। একটু জল খাবে! না। বমি-বমি লাগছে। কান গরম, চোখের ডিম ঝাঁ-ঝাঁ করছে।

'এই সুকুমার লিখছিস নে—' ডেকের ওধার থেকে পরিতোষের গলা।

অ্যা! তবে কি সে ধরা পড়ে গেছে! তার ভালোব্বের মুখোশ খসে পড়েছে! আরো লজ্জায় কঁকড়ে ছমড়ে গেল সুকুমার।

সুকুমার উত্তরপত্র খুলে বসল। হ্যাঁ, লিখতে হবে। কিন্তু, মাথার ভেতরে সবকিছু হিজিবিজি হয়ে গেছে। জমানো কণ্ঠস্থ-করা বিদ্যেগুলির গায়ে কে দোয়াত-ভরতি কালি উলটে দিয়েছে।

একটি অক্ষর পড়া যায় না, একটুও উচ্চার করে আনতে পারে না স্মরণের পথে।

পরীক্ষার উদ্দেশ্যে জলন্ত বয়লায়ের মতো যখন সমস্ত হল-ঘরটা টগবগ করছে, সুকুমার নিবস্ত ঠাণ্ডা উম্মনের মতো স্থির।

‘কী খোকা, লিখছ না? প্রশ্ন শব্দ হয়েছে বুঝি—’ টহল দিতে দিতে শ্বেনদৃষ্টি গার্ড একবার জিজ্ঞেস করল।

সুকুমার আর চোখ তুলে চাইতে পারে না। অনেক দিনের অনেক অসুখেভোগা মনের মতো নিজেকে পীড়িত বোধ করে।

আবার প্রশ্নপত্র পড়ল সে, না, একটি কি দুটি উত্তর আবছা-আবছা মনে আসছে, ছেঁড়া-খোঁড়া, সূত্রহীন। ভূগোল মানে মাথা-গোল—তবে কি মাথার কিছু গোলমাল শুরু হয়েছে তার!

‘বাইরে যাব—’ হঠাৎ সমস্ত হল-ঘরটাকে শব্দিত করে উঠে দাঁড়াল সুকুমার।

‘বাইরে! আচ্ছা যাও—’

মাথা হেঁট করে বেরিয়ে এল সুকুমার। কিন্তু কোথায় যাবে। ইস্কুলের গেট বন্ধ। পিছনের পাঁচিল টপকে এই বন্দীশালা থেকে বেরিয়ে পড়তে পারে না—দূরে, যেদিকে ছুচোখ যায়!

বাথরুমের দিকে হেঁটে গেল সুকুমার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। বাইরে এসেও সত্যিকার বাইরে আসতে পারে না যেন। ভালো, ভালো ছেলে। সেরা ছেলে, আদর্শ ছেলে আমাদের সুকুমার।

না। ভালো হওয়ার দাম তাকে দিতে হবে। এতগুলি লোকের বিশ্বাস উপড়ে ফেলবার সাধ্য নেই সুকুমারের।

আরে! আনন্দে না আংশকায় সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল সুকুমারের।

বাথরুমের ছাদের নিচে গর্তটার মধ্যে ওটা...ওটা কি! হ্যাঁ—তাই তো। ছোঁড়া-খোঁড়া একটা ভূগোলের ডাইজেস্ট। কাঁপা

হাতে ওটা টেনে বার করল সুকুমার। পেয়েছে, পেয়েছে সে। সে ভালো ছেলে, শেষ পর্যন্তও তাকে এই ভালোখের অহংকারকে বজায় রাখতে হবে। উপায় নানা আকারের হতে পারে, কিন্তু তার লক্ষ্যস্থল এক। ডেনের নোঙরা জলও গিয়ে গঙ্গায় মিশছে। তখনো তার নাম গঙ্গা।

দার্শনিক হয়ে উঠল সুকুমার।

তারপর ডাইজেস্টটাকে গুঁজে নিল বেণ্টের তলায়।

সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখ অন্ধকার করে বাড়িতে ফিরতে পারবে না কিছুতেই। পাঁচ ভাইবোনের ছোট্ট আদরের সেয়া ছেলে, সু-কুমার। 'কী—লেটার পাবি তো?' 'ভারতবর্ষের ম্যাপ এঁকেছিস তো?' এমনি উত্তত প্রশ্নগুলির সামনে কেমন করে দাঁড়াবে সে? কেমন করে বলবে: 'ব্ল্যাক খাতা দিম্বে এসেছি।' কেউ বিশ্বাস করবে না, হাসবে, ভাববে রসিকতা করছি। তারপর যখন বিশ্বাস হবে তখন...তখন আর ভাবতে পারছে না সুকুমার।

মরিয়া হয়ে পরীক্ষা-হলের দিকে স্থিরপায়ে এগিয়ে গেল সে।

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত।

ছঃসংবাদ পেয়ে বাবা অনিমেঘ চেয়ে থেকে কেবল জিগ্যেস করলেন: 'তুই—তুই একাজ করলি? এইভাবে আমাদের মাথা হেঁট করলি?'

সুকুমার বলতে পারে নি, বলতে পারে নি: 'তোমরাই তো আমাকে ভালো ছেলে হতে বলেছিলে বাবা!'



জন্মাবার পর থেকে কথা বলার সময়টুকুর যে অ্রপেক্ষা! মাত্র মৃত্যুও মনে দাগ কাটতে পারেনি, ষতটা দাগ কেটেছিল মাটিতে লুয়ে-পড়া জানালাহীন আলোবিহীন গোলাকার কুঁড়ে ঘরের হতস্ত্রী চেহারা, আর হামাগুড়ি দিয়ে পোকার মতো ঘরের ভেতরে ঢোকা আর বেরোনো।

শ্রীমন তাই বিশ্বয় প্রকাশ করে জোয়ান বাপ ধীমনকে জিগোস করেছিল : 'বাবা আমাদের ঘর এমন কেন ?'

হাতের বাঁটালি দিয়ে পাথরের মূর্তি খুঁদতে খুঁদতে ধীমন বলেছিল ; ‘দেবতার রোষভঙ্গে আমরা নিত্যই মাথা মুইয়ে থাকব এই হচ্ছে রীতি। আমাদের বংশের এক ছুঃসাহসী পুরুষ দেবতার পরোয়া করে নি, আকাশউঁচু ঘর বানিয়েছিল, সোজা হয়ে সে ঘরে ঢুকত, কোনোদিন মাথা নোয়ায় নি। কিন্তু...কী হল?’

‘কী হল?’ শ্রীমনের চোখের তারা কৌতুকে জলে উঠেছিল।

‘কী হবে?’ কপালের উপর থেকে ঘামের ফোঁটাগুলো মুছতে মুছতে বললে ধীমন : ‘দেবতার রোষে একদিন তার পতন হল। আকাশউঁচু ঘরের তলায় তার জীবন্ত সমাধি হল।’

‘দেবতা নেই।’ শ্রীমন বললে।

‘চুপ চুপ—’ ছুটে এসে মুখ চেপে ধরলে ধীমন, ‘দেবতার অভিশাপ লাগবে। নে হাঁটু গেড়ে বোস—ক্ষমা চা’—বল : দেবতা অবোধ বালকের মূঢ়তা ক্ষমা করে।’

শ্রীমন জেদী ঘোড়ার মতো ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়াল। বললে, ‘আগে দেখাও তোমার দেবতা—’

থরথর করে কাঁপতে লাগল ধীমন। অজানা শংকায় দামাল উদ্বেজনায়ে কদম্বকেশরের মতো কণ্টকিত হয়ে উঠতে লাগল তার সমস্ত শরীর। চোয়ালের হাড়ছটোয় দৃঢ় চাপ দিয়ে একটানে ছেলের বাহু আঁকড়ে ধরল সে। তারপর হিড়হিড় করে তাকে টেনে নিয়ে চলল বস্তি পেরিয়ে, নারিকেলের বীধি পার হয়ে। সন্ধ্যা নেমেছে তখন দিগন্তে পাখা মেলে। হঠাৎ সামনের দিকে দুই হাত মেলে দিয়ে ধীমন বলল, ‘আখ—ওই দেবতা—পিঙ্গল কালো ক্রুদ্ধ...’

শ্রীমন চেয়ে দেখল : রাশি রাশি জলরাশি উস্তাল ক্ষিপ্ত...সাপের মণির মতো জ্বলছে তরঙ্গের চোখ...শত সহস্র নিযুত...ক্ষুধার্ত ছোবল বেলাভূমিকে জর্জরিত করে দিচ্ছে...আর প্রচণ্ড অবিধ্বাসী হাশ্বকে বিক্রপ করে একটানা গৌঁ গৌঁ শব্দ...ভীম, ভয়ংকর, হাওয়ায় তার প্রতিধ্বনি, আকাশে ভয়ার্ত তন্তু হরিণীর মতো মিটিমিটি নকত্রের চোখ।

শ্রীমন মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল নক্ষত্র-কাঁপা আকাশের দিকে, আর বিরাট আকাশের বন্ধপটের তলায় স্নমুখের কৃষ্ণ জলরাশির দিকে। শ্রীমনের মুখেচোখে কবির কোমল মোহাবেশ। তারপর একটু চুপ থেকে একসময় প্রগলভ হেসে উঠল সে। বললে, 'ও তো সমুদ্র...দেবতা কোথায়?'

'চুপ কর অবিশ্বাসী।' ধমক দিয়ে উঠল ধীমন : 'ছাখ চেয়ে ছাখ এই নারকেল গাছটার দিকে...দেবতার সংগে স্পর্ধা করতে চেয়েছিল, দেবতা ওর পাখাগুলো কেটে দিয়ে ছুমড়ে মুচড়ে নিকেশ করে দিয়েছে...ভাঙা ডালাপালা সোজা করবার সামর্থ্য আর নেই।'

আর দাঁড়াল না ধীমন। হনহন করে' বাড়ির পথ ধরল। হাতের কাজটা আলো জ্বলে আজ শেষ করতেই হবে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকত শ্রীমন বলা যায় না। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সেও ফিরল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা : এ দেবতাকে জয় করতে হবে।

সকালের লোহিত সূর্য হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠত সমুদ্রগর্ভ থেকে : পূর্ব দিকে রক্তমাখা জলের রঙ বদলাতো, রূপালী সূর্যের সংগে তাল রেখে জলের রঙ চিকচিক করত রজত-শুভ্রের মতো। যখন মেঘের ছায়া ঘনাত আকাশে, সমুদ্রের রঙ বিচিত্র আলোছায়ায় লুকোচুরি খেলত। কখনও পিঙ্গল কখনও সবুজ কখনও পাঁড়াশে : বাদামী পাল তুলে নৌকোর খোলে জালিয়ারা মংশ-শিকার করতে করতে ভেসে যেত দূর-দিগন্তে। ছ'একটা পাল তোলা পোত মৃদুমন্দ গতিতে পাড়ি জমাত অজানা দ্বীপের উদ্দেশে।

ঝাঁপিয়ে পড়ত শ্রীমন। সমুদ্রের বাঁচিমালার নাগর-দোলায় আপন মনে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত, কখনো ডুব দিয়ে ফেনানো ঢেউগুলোকে ফাঁকি দিত, শেকায়দায় পড়ে ছ'একবার নাকানি-চোবানি খেয়ে বেলাছুমিতে আছড়ে পড়তেও খারাপ লাগত না। চিত হয়ে প্রকাণ্ড আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে এক একসময়

মনে হত শ্রীমনের : সেই-ই যেন সমুদ্র, হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আকাশকে আলিঙ্গন করবার জন্তে। 'আমি সমুদ্র, আমি দেবতা...' বিড়বিড় করে' বলে উঠত সে।

ধীমনের বারণ ছিল : পূর্ণিমায় কী অমা রাত্রিতে যেন জলে না নামে সে। সেদিন দেবতা প্রচণ্ড হয়, ক্ষুধার্ত জিহ্বায় দুর্বল মানুষকে গ্রাস করে।

নিবেধ শোনেনি শ্রীমন। সমুদ্রতীরে মানুষ, জলকে ভয় করতে শেখেনি। ছ'একদিন পরেই পূর্ণিমা। আকাশে রহস্যময় জ্যোৎস্না-লোক, সমুদ্রের জলে কে যেন জ্যোৎস্না-রঙের পাত বিছিয়ে দিয়েছে। বেলাভূমি, সমুদ্র, আকাশ—আজ কবিত্বময় আচ্ছন্নতায় নিমগ্ন। বাড়ি থেকে চুপিচুপি পালিয়ে এসে অনেকক্ষণ বালির মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল শ্রীমন, পায়ের পাতা ভিজে যাচ্ছে। হঠাৎ মনে হল : সমুদ্রের জল যেন লক্ষ লক্ষ পাখা পেয়েছে, আর একযোগে সকলে আকাশে উড়তে লেগেছে। চেউয়ে চেউয়ে এক করুণ বিবাদের সুর, ও-পাড়ার নাপিতের ছেলেটা বোধ হয় বাঁশি বাজিয়ে চলেছে। জল টানতে লাগল শ্রীমনকে। কাছে পিঠে এধারে ওধারে কোথাও জনপ্রাণী নেই। নিঃসঙ্গ বিপুল নির্জনতা।

পায়ের গোড়ালি ডুবল শ্রীমনের, হাঁটু ডুবল। তারপর ফিশফিশ করে বললে, 'দেবতা আমি আসছি। তোমার ক্রোধ আমি দেখতে চাই।'

সমুদ্রের জলে আজ তরঙ্গের দাপট নেই। হুহু করে' জল বাড়ছে, ফুলছে, উচ্ছ্বসিত হচ্ছে জোয়ারের টানে। চিত হয়ে ভাসতে লাগল শ্রীমন, হাত-পা ছেড়ে দিয়েছে আপন খেয়ালে। তারপর উপুড় হল সে, ছ'বাহু দিয়ে জল কেটে সাঁতার কাটতে লাগল। কতক্ষণ সাঁতরে চলেছে, খেয়াল নেই। হঠাৎ গায়ে শিহরণ বয়ে গেল শ্রীমনের। কেমন যেন জলের প্রচণ্ডতা বেড়েছে, শ্রোতের তীব্রতা যেন পেছন দিক থেকে প্রকাণ্ড হাতে ধাক্কা মারছে তাকে।

তবে কী...দেবতা ক্রুদ্ধ হয়েছেন? গা ছমছম করে উঠল তার। পেছন ফিরে দেখল তার থেকে অনেকদূর এসে গেছে সে। না, এবার ফেরা দরকার। ক্ষুদ্র বাছুর আন্দোলনে ক্ষিপ্র বেগে সাঁতার কাটতে লাগল সে। কিন্তু...একী হল! জলের তলা থেকে নিঃশব্দ একটা চোরা শ্রোত তাকে যেন উল্টো দিকে ঠেলে দিচ্ছে—যেখানে সমুদ্র বিশাল, অপার, তীর নেই, লক্ষ্য নেই—অনন্ত অসীম গভীরতা। প্রাণপণ বেগে সাঁতার কাটতে লাগল শ্রীমন, কিন্তু ছ'বাহুতে ব্যথা হয়ে গেল তার, হাঁফাতে লাগল, ছলেছলে উঠতে লাগল বুকটা। না, এক গজও সে তীরের দিকে এগোতে পারে নি। ক্রমশ শ্রোতের টান যেন তাকে তীর থেকে দূরে বহুদূরে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। একবার মাথা তুলে দেখল শ্রীমন...দূরে, অস্পষ্ট রেখার মতো বেলাভূমি দেখা যাচ্ছে, পাড়ের সেই ভগ্নদশা নারকেল গাছের ছায়া, আর কিছু নয়। আর পারছে না সে, সারা হাত ব্যথিয়ে উঠেছে, দম ফুরিয়ে গেছে, বার কয়েক লোনা জল গিলে ফেলল সে।...শেষ বারের মতো সমস্ত চেতনা ডোববার পূর্বক্ষণে দূরের থেকে ভেসে-আসা বৃষ্টির শব্দের মতো কানে গেল বাবাব কণ্ঠস্বর : 'শি-রি-ম-ন...' একবার বোধ হয় ক্ষুদ্র বাছ তুলে নিজের অস্তিত্বকে জানাবার চেষ্টা করেছিল, তারপর আর কিছু মনে নেই। কী করে সেই উত্তাল তরঙ্গরাশির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার বাবা তাকে নিয়ে ডাঙায় তুলল, সে কথা ভাবতেও স্বপ্নের মতো লাগে।

সুস্থ হবার পর একদিন বাবা তাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন :  
'দেবতার সঙ্গে ছেলেখেলা করতে নেই।'

শ্রীমন কোনো উত্তর দেয়নি। বাবাব সাবধানবাণী কতদূর কানে পৌঁছেছিল তার, বোঝা যায় নি।

তারপর কয়েক বছর কেটে গেছে।

একদিন সমুদ্রতীরে বেড়াতে বেড়াতে একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখল শ্রীমন। তীর থেকে কিছু দূরে সমুদ্রের ওপরে আকাশের তলায় হঠাৎ একটা নাম-না-জানা পাখি কয়েকবার আকাশে ঘুরপাক খেয়ে রূপ করে ডুবে গেল সমুদ্রের জলের নিচে। আর উঠল না। দৃশ্যটা ওর চোখে বড় অদ্ভুত ঠেকল।

বাড়িতে ফিরে এসে শ্রীমন বাবাকে দৃশ্যটার কথা বলতেই ধামন কেমন ভীত ত্রস্ত হয়ে উঠল। তারপর বিড়বিড় করে বললে, ঠিক এরকম দৃশ্য তার ছোট বেলাতেও একবার ঘটেছিল। আর তার পায়ে-পায়েই এল রাজ্যের দুর্দিন, মঘস্তর আর লোকক্ষয়।

ধীমনের আশংকা ব্যর্থ হল না। কিছুদিন পরেই দুর্ভিক্ষের করালগ্রাস ছেয়ে ফেলল গোটা রাজ্যটাকে। বছরের পর বছর ধরে দুর্ভিক্ষের উৎকট রূপ প্রকট হয়ে উঠল।

এমন সময়...একদিন অশ্বক্ষুরের ধূলি উড়িয়ে রাজার সামস্ত এসে দাঁড়াল ধীমনের বাড়ির দরজায়।

অনশনে অনাহারে শীর্ণ ধীমন হাত জোড় করে দাঁড়াল রাজপুরুষের সামনে। 'প্রভু, রাজকর দিই আমার এমন সাধ্য নেই।'

হো হো করে' হাসল রাজপুরুষ। 'রাজকর তোমায় দিতে হবে না ধীমন। রাজপুরী থেকে তোমায় নিতে এসেছি। রাজা শম্ভু তোমায় স্মরণ করেছেন।'

রাজা শম্ভুর নামে আরো বিভীষিকাগ্রস্ত হয়ে উঠল ধীমন। বিলাসী রাজার নেকনজরে যে পড়েছে তার রক্ষা নেই।

অভয় দিল রাজপুরুষ : 'ভয় নেই। রাজা তোমায় যথাযোগ্য সম্মানেই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তুমি এ রাজ্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পী... রাজকর্ণের মণিহার তোমার কণ্ঠেই ছলবে।'

সমস্ত কিছু রহস্যময় ঠেকতে লাগল ধীমনের কাছে। রাজার অত্যাচারের মতো! অল্পগ্রহও তার মতো মানুষের পক্ষে গ্রহণ করা

শক্ল। কিন্তু উপায় নেই। যাত্রার আয়োজন করতে লাগল ধীমন। শ্রীমনও পিছন ছাড়ল না।

পরদিন দুই প্রহরের সময় রাজার খাশমহলে ডাক পড়ল ধীমনের। নতজাহ্নু হয়ে প্রশাম করে ভয়ে ভয়ে দাঁড়াল সে।

অনেকক্ষণ শিল্পীর দিকে চেয়ে থেকে ধীর গলায় রাজা শব্দ বললেন, 'ধীমন, আমি জানি তুমি এ রাজ্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। শ্রেষ্ঠ শিল্পীর হাতে শ্রেষ্ঠ কীর্তি রূপায়িত হয়ে ওঠে। সূর্যদেবের কৃপায় আমি আজ রোগমুক্ত। দেবতাকে আমি সমুজ্জ্বলতীরে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। এমন ভাবে সূর্যমন্দির পরিকল্পনা করবে যেন যুগ যুগ ধরে লোক তার দিকে চেয়ে চেয়ে হতবাক হয়ে যায়।'

ধীমন বললে, 'প্রভু, আমি এ-সম্মানের যোগ্য নই।'

শব্দ বললেন, 'মাঠেঃ। কাজে নিযুক্ত হও। দেবতা তোমার সহায় হবেন। অর্থের অভাব হবে না—আমি কর্মচারীদের আদেশ দিয়েছি মাথাপিছু প্রত্যেক প্রজার কাছ থেকে কর গ্রহণ করা হবে। দেব-প্রতিষ্ঠার পবিত্র দায়িত্ব প্রজাকুলকেই নিতে হবে। যত প্রস্তর লাগে—উদয়গিরি-খণ্ডগিরি থেকে তা আসবে। যত লোক চাও, মজুর চাও, আমি মস্তকীকে আদেশ দিয়েছি, পাবে। দেবতার নাম করে শুভকাজ শুরু করো।'

ঘর্মাজ্ঞ কলেবরে ফিরল ধীমন। বাড়িতে ফিরে ছ'মাস ধরে কেবল পরিকল্পনাই করল সে। এত বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার তার কাঁধে কোনোদিন পড়েনি।

কতদিন রাতে ঘুম ভেঙে গিয়ে শ্রীমন দেখেছে বাবা পাথরের মতো বসে আছে, কখনো পায়চারি করছে। চিন্তার কালিতে শীর্ণ মুখ। তারপর হঠাৎ একদিন শিল্পীর চোখে আগুন জ্বলে উঠল, সার্থকতার আনন্দে জয়োদ্ধত হয়ে উঠল মুখমণ্ডল।

'পেয়েছি, পেয়েছি'—পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল ধীমন।

পরিকল্পনা শুনে রাজা শব্দ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। 'চমৎকার,

চমৎকার ধীমন, যথার্থই তুমি শ্রেষ্ঠ শিল্পী। চতুষ্চক্রযুক্ত অশ্ববাহী রথের মাধ্যমে তুমি একটা মন্দিরকেই রূপায়িত করে তুলবে— আমাদের এই মন্দির গুম্ফার দেশে এমন পরিকল্পনা কেউ করেনি।' বলে আপন গলার মাল্যহার রাজা ছুঁড়ে দিলেন ধীমনের দিকে।

তারপর বৎসর অতিবাহিত হতে লাগল।

দ্বাদশ বৎসরে দুর্ভিক্ষ দিয়ে সূর্যমন্দির উঠল গড়ে। করভারে প্রজাকুলের পিঠ গেল বেঁকেচুরে—আর সেই পিঠের ওপর দেবতা অধিষ্ঠিত হলেন। ঠিক মন্দিরের গা বেয়ে নীল সমুদ্র, পূব দিকের দিগন্ত হতে লাল সূর্য আবির্ভাব হতে মন্দিরের গায়ে, সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্তের বর্ণালী, বিচিত্র রঙে মন্দির-চত্বর বলমলিয়ে উঠতে লাগল। নীল সমুদ্রের কোলে মন্দিরটা যেন প্রস্তর-স্বপ্ন বুনতে লাগল।

শিবিকা-বাহিত হয়ে রাজা শশ্ব এলেন মন্দির-দর্শনে। ঘুরে-ঘুরে সমস্ত মন্দিরের কারুকার্য দেখাল ধীমন। এই চাকা গড়তে লেগেছে ছ'বছর, অশ্বযুগলকে মূর্ত করতে ছ'বছর, রথ তৈরি করতে গেছে আরো কয়েক বছর। নিপুণ শিল্পীর প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে সমস্ত মন্দিরটা। নিজের মনেই হাসল ধীমন। তারপর বললে, 'মহারাজ, আজ আমি জরাগ্রস্ত, বার্ধক্যের নামাবলী আমার সর্বাংগে, কিন্তু এ মন্দিরে জরার স্থান নেই, বার্ধক্যের চিহ্ন নেই। যেদিন আমি থাকব না, সেদিনও আমার যৌবন বন্দী থাকবে এই প্রস্তর-মন্দিরের প্রতিটি পাষাণে।' একটু থেমে মুহূর্তে গলায় জানাল ধীমন : 'রাজা, এবার আমার ছুটি।'

রাজা শশ্ব শিল্পীর হাত ধরে আবেগ-জড়ানো গলায় বললেন, 'তুমি দেব-শিল্পী তোমায় মুক্তি দেবার আমি কে ? তার আগে আর একটা কাজ বাকি, মন্দিরের চূড়ায় আমি স্বর্ণ কলস স্থাপন করতে চাই।'

'মহারাজের নির্দেশ প্রতিপালিত হবে—'মাথা নত করে জানায় ধীমন।

পরদিন রাজপুরী থেকে স্বর্ণকলস এল।

কিন্তু...একী হল। কলস তো কিছুতেই স্থাপিত হয় না।  
 যতবার তাকে বসাতে গিয়েছে পড়ে-পড়ে যাচ্ছে কলস। বার্বক্যোর  
 হিম-হিম রক্ত কেমন জমাট বাঁধতে চায়। তবে কী হাত কাঁপছে  
 ধীমনের, স্থির হাতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছে না কলস! চূড়াগের  
 প্রস্তর খণ্ডটা আবার বাঁটালি দিয়ে খুঁদতে লাগল সে, কলস বসবার  
 মতো গর্তও করল পাথরের মাঝখানে। কিন্তু, কলস বসে না।  
 তবে একী হল! দরদর ধারায় ঘাম ঝরতে লাগল সারা শরীর  
 বেয়ে, সকালের শুভ্র আকাশটা হঠাৎ চোখের স্মুখে বাদলের  
 ঘনঘটায় ভরে উঠল। সন্ধ্যা পর্যন্ত পরিশ্রম করে, ব্যর্থ হয়ে বিষণ্ণ  
 মনে নেমে এল ধীমন।

একদিন। দু'দিন। তিনদিন।

রাজার কানে খবর পৌঁছল। ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলেন রাজা।  
 'একী হল শিল্পী—দেবমন্দিরে কোন্ অবিশ্বাসীর ছায়া পড়েছে—'

'আমি জানি না মহারাজ। যদি সন্দেহ হয় আমিই সেই  
 অবিশ্বাসী, কৃপাণ ধরুন, আমার পাপরক্তে মন্দিরকে শুচি করে যাই।'

'ছি ছি! তোমাকে অবিশ্বাস করব তবে বিশ্বাস করব কাকে।  
 তুমি আবার চেষ্টা করো ধীমন। দেবতাকে স্মরণ করো। স্বর্ণ-  
 কলস চূড়ায় প্রতিষ্ঠা করতেই হবে।'

সারারাত্রি চোখে ঘুম নেই ধীমনের। ধীর চরণে কেবল  
 পদচারণা করে' চলেছে।

যুবক শ্রীমন এসে জিজ্ঞেস করে : 'বাবা, কী হয়েছে তোমার ?  
 কী ভাবছ এত ?'

'না। কিছু নয়।'

'বাবা, আমি জানি সব। স্বর্ণকলস স্থাপিত হয়নি।...সেই  
 অবিশ্বাসীকে আমি খুঁজে বের করেছি, বাবা। দেখবে কাল  
 সকালেই কলস স্থাপিত হবে।'

‘কই, কোথায় সে?’ উদ্বেজিত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল ধীমান।  
 ‘আমি তাকে বন্দী করে রেখেছি। কাল সকালেই তাকে পাবে।’  
 প্রত্যুষের কাকলীগীতি শোনা না-যেতেই ধীমান শয্যা ত্যাগ করল।  
 ‘শ্রীমন—শ্রীমন—’

শ্রীমনের দেখা নেই। সেই সাত-সকালেই বা’র হয়ে গেছে  
 সে। দ্রুত পায়ে সমুদ্রসৈকতে এসে দাঁড়াল ধীমান। আথাড়ি  
 পাথাড়ি তরঙ্গের শব্দ। সোঁ সোঁ হওয়ার একতান। ‘শি-রি-মন’...  
 হাঁক দিতে-দিতে সে মন্দিরের দিকে ছুটে চলল। হঠাৎ শুরু হয়ে  
 রইল ধীমান। মন্দিরের চূড়ায় আলো-আঁধারি ছায়ায় ও স্বর্ণ  
 মূর্তি। স্বর্ণ চোখে তাকাল সে, কে? স্বর্ণকলস হাতে ও কে?  
 শ্রীমন! শ্রীমন ওখানে কী করছে?

‘শি-রি-মন-ন...’ হাঁক দিতে দিতে পাথরের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে  
 লাগল ধীমান। ‘শি-রি-ম-ন-ন...’ শি-রি-ম-ন .’

নিচু থেকে বাবার চিৎকার এবার কানে গেল শ্রীমনের। ওখান  
 থেকে চেষ্টা করে বললে সে : ‘বাবা—সেই অবিশ্বাসীকে পেয়েছি...  
 স্বর্ণকলস প্রতিষ্ঠা এবার হবে।’

‘শিরিমন, তুই নেবে আয়। আমি তোর বাপ, আদেশ করছি  
 নেবে আয়—’

ওপর থেকে শ্রীমন কী জবাব দিচ্ছিল শোনা গেল না, তার  
 আগেই হুড়মুড় করে বিরাট শব্দে একটা বিরাট পাথরের চাঁই  
 গড়িয়ে পড়তে লাগল, আর পাথরের চাঁইটা থেকে বোধ হয়  
 একবার ‘বাবা’ আওয়াজও শোনা গিয়েছিল। ধীমান সিঁড়ির  
 মাঝামাঝি দাঁড়িয়েই বিস্ফারিত নয়নে দৃশ্যটা প্রত্যক্ষ করল :  
 পাথরের চাঁইটার সঙ্গে সঙ্গে অতো উঁচু থেকে শ্রীমনের দেহটা  
 কি করে পাথরে আছাড় খেতে-খেতে একটা বিন্দুর মতো গড়িয়ে  
 পড়ল সমুদ্রের কিনারে, আর লোলুপ রসনা মেলে কেমন বারবার  
 ধাবা মারতে লাগল তরঙ্গরাশি।

আর কী আশ্চর্য, উদ্ভূত পাথরটা খসে গিয়ে খাপে খাপে  
 আটকে গেছে চূড়ার আগায় স্বর্ণকলসটি।

# রক্তের রঙ লাল



বড়বাবুর সামনে আসামীকে এনে হাজির করা হল।

আসামীকে দেখে অবাক হলেন বড়বাবু। জীবনে এ ধরনের বিচিত্র দৃশ্য তিনি আর ছাখেননি।

রোগা, ময়লা পিরান ধূতি, অগোছালো চুল, রোদে তামাটে মুখ, দৃষ্টিও কেমন লাজুক-লাজুক। বয়েস বোধকরি চোদ্দ-পনেরোর বেশি হবে না।

এই ছেলেই নাকি পলিটিকাল মামলার একনম্বর আসামী। পুলিশ একেই রিভলভার হাতে হাতেনাতে ধরে ফেলেছে। নইলে ভারতের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের অকাল প্রয়াণ ঘটত!

তবে কি সম্ভ্রাসযুগ ফিরে এল! ভাবলেন বড়বাবু। টেগরা বল।

‘কি নাম তোমার?’

‘আমার নাম না-জেনেই কি ধরেছেন?’ কিশোর উত্তর করল।

‘ছম!’ বড়বাবু গম্ভীর উদ্গার করলেন।

‘তোমার হাতে রিভলভার এল কি করে? টয় তো নয়, একটা শক্তিশালী আগ্নেয় অস্ত্র?’

‘এল। দেখতেই পাচ্ছেন।’

‘এই ব্যেবে তোমার হাতে বইখাতা মানায়, রিভলভার নয়।’

‘আপনি কি জানেন ইস্কুল থেকে আমার নাম কাটা গেছে?’

‘কেন?’

‘কেন আবার, আপনার সরকার চোদ্দ বছরের ছেলে-পড়াশোনা অবৈতনিক করে দেননি বলে।’

বড়বাবু বললেন, ‘পড়াশোনা করতে পারলে না-বলে এই বোম্বাটেপনা?’

কিশোর বলল : ‘কী করবো বলুন, তিনদিন থেকে বাড়িতে খেতে পাইনে। আমার ছোট বোন নীলু, সেদিন মারা গেল। মা কাঁদল, বাবা কাঁদল। আমি নিজে ওকে মাঠে গিয়ে পুঁতে দিয়ে এলাম।’

বড়বাবু বললেন, ‘দারিদ্র্য একটা জাতীয় সমস্যা, একদিনেই তো যাবে না ভাই।’

কিশোর বললে, ‘ততদিনে আমার বোন মারা যাবে। কেন? এই জাতীয় সমস্যাকে বোঝাবার জগে? পারেন আপনি আমার বোনকে ফিরিয়ে দিতে? পারেন না।’

‘তাই বলে হাতে রিভলভার তুলে নেবে? এই অস্ত্র দিয়ে তুমি দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করবে? জানো, আমাদের শক্তি কত?’

‘না, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে নয়, আপনাদের ওই শক্তির বিরুদ্ধেই আমি লড়াই করতে চাই।’

বড়বাবু বললেন, ‘তোমার কথাগুলো ঠিক তোমার বলে মনে হচ্ছে না। শেখানো কথা।’

কিশোর বললে, ‘জন্মের পরেই তো মানুষ শেখে বড়বাবু।’

আমার ব্যয়ে কী আপনার কোনো বোন মরেছে না-ধেতে পেয়ে !’

‘আমি বেশ বুঝতে পারছি তোমার পেছনে দল আছে, তাদের বড়বন্ধে তোমার জীবনকে ছারখার করে দিতে চলেছ। আমি তোমার বাপের বয়সী, আমি তোমাকে বাঁচাব—’

‘মাপ করবেন, আমার বাবাকে আমি চিনি, বাবার যন্ত্রণাকে আমি বুঝতে পারি। আপনি কী করে আমার বাবাকে বুঝবেন। গরিবের বাবারা অশু জাত।’

‘আবার গরিব-বড়লোকের কথা কেন ? সব বাবাই এক।’

‘না। এটা আপনার ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা। আপনি বাবা না হয়েও আপনার কর্তব্য করতে পারেন, আমি আমার কর্তব্য করেছি।’

বড়বাবু বললেন, ‘তুমি মিটেও ডায়াসে রিভলভার উচিয়ে উঠেছিলে—’

কিশোর বললে, ‘হ্যাঁ। আমার একটু দেরির জগে ট্রিগার টিপতে পারিনি।’

‘জানো, কী বলছ তুমি, তোমার কথার কী মানে ?’

‘আমি একটা ভালুক শিকার করতে গিয়েছিলাম।’

‘ভালুক !’

‘একই কথা। আমাদের ছুজনের একসঙ্গে বাঁচা চলে না। একজনকে যেতেই হবে।’

‘জানো, এটা ভয়ংকর রাজনৈতিক অপরাধ। এই অপরাধে তোমার প্রাণদণ্ড হতে পারে।’

‘জীবন একটাই বড়বাবু।’

‘তোমার প্রাণের মায়া নেই ? নিজেকে ভালোবাসো না ?’

‘আছে। ভালোবাসি বলেই পথের বাধাগুলোকে দূর করতে চাই।’

বড়বাবু বললেন, 'বাইরে তোমার মা-বাবা এসেছেন। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

কিশোর বললে, 'তাদের সঙ্গে দেখা করে আমার কি হবে?'

'তুমি মা-বাবাকে ভালোবাসো না?'

'দেখুন, আমি এখানে কোন পারিবারিক নাটক অভিনয় করতে আসিনি। আপনার যদি দরকার না-থাকে আমাকে লক-আপে যেতে দিন।'

'তাহলে তুমি কিছুই বলবে না?' বড়বাবু এবার অশ্রু মুর্তি ধরলেন : 'রামসিং—'

'হোজোর।' রামসিং সেলাম করল।

'একে নিয়ে যাও। যতক্ষণ না কিছু স্বীকার করতে রাজি হচ্ছে—'

'জী।'

কিশোরকে অন্ধকার কুঠুরিতে রাম সিং ধরে নিয়ে এল।

'বোলো খোকা, সাচ্ বাত বোলো।'

কিশোর নীরব।

হঠাৎ তলপেটে একটা ঘুঁষি।

কিশোর ছিটকে পড়ল দেওয়ালে। সশব্দে মাথাটা যেন ফেটে পড়ল।

রাম সিং বেড়াল ছানার মতন ওকে আবার তুলে নিল।

'বোলো ভাই, সাচ্ সাচ্ বাতাও। হা রাম।'

ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরল কিশোরের। ছোটো দাঁত ছিটকে বেরিয়ে গেল। দর দর করে ঘামছে কিশোর। হি হি করে কাঁপছে।

'কুছু বোলবে না?'

বড়বাবু হাঁকলেন : 'রাম সিং। আসামীকে নিয়ে এসো।'

কিশোরের বেছঁশ শরীরকে হেঁচড়ে নিয়ে এল রামসিং।

বড়বাবু বললেন, 'এই যে তোমার মা-বাৰা বসে আছেন তোমাকে কিছু বলবেন।'

'মা।'

'খোকা, একী চেহারা করেছে এরা তোর?'

'মা, একটু জল—'

'রাম সিং, এক লোটা পানি লে আও।'

রাম সিং এক লোটা জল এনে ওকে দিতে গেল।

বড়বাবু হাঁকলেন, 'দাড়াও, কী খোকা এবার সত্যি কথা বলবে?'

কিশোর ঘোলাটে চোখে তাকাল। 'জল—'

'নিশ্চয়ই। তার আগে তোমাকে বলতে হবে—'

কিশোর বিড়বিড় করে বললে, 'বলব বলব।'

'রাম সিং পানি দেও।'

কিশোর জল পান করতে গিয়ে বমি করে ফেলল।

'হা রাম।' রাম সিং আওয়াজ করে উঠল।

'বড়বাবু এত রক্ত কেন? খোকায় যে বুক ভেসে যাচ্ছে— মার গলায় আৰ্তনাদ।

বড়বাবু ব্যস্ত হলেন : 'কই দেখি।'

বুকের নীচে একটা গভীর ক্ষত। দগদগে তাজা ঘা। ক্ষতটার ওপর থেকে কাঁচা চামড়াটা ছিঁড়ে গিয়ে রক্ত ঝরছে।

বড়বাবু ব্যঙ্গ করে বললেন, 'এই রোগা হাড়জিরজিরে শরীর নিয়ে ও লড়াই করতে চলেছে। রাম সিং-এর ছুটো লাথি যে সহ করতে পারে না! রাম সিং ডাক্তার সাব্বো বোলাও।'

কিশোরের চেতনা ফিরল হাসপাতালের বেড়ে।

বিকেল হলে বড়বাবু এলেন : 'এখন কেমন বোধ করছ?'

কিশোর বললে, 'ভালো।'

‘তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠতে হবে। তোমার জবানবন্দীর ওপর গুরুত্বপূর্ণ মামলা নির্ভর করছে। আমাদের তড়িঘড়ি অনুসন্ধান শুরু করতে হবে। উছ’, নড়াচড়া করো না, ডাক্তার বলেছেন কোনো কারণে ব্যাণ্ডেজ খুলে গেলে আর তোমাকে বাঁচানো যাবে না। শরীরে তোমার রক্ত নেই।’

ছুদিন পর।

বড়বাবু ঘনিষ্ঠ হয়ে ওর বেডের সামনে চেয়ার টেনে বসলেন। কোলের ওপর ডায়েরির পাতা খোলা, পেনসিল বাগিয়ে ধরা।

‘এবার তুমি শুরু করতে পারো।’ বড়বাবু অভিভাবকের গলায় আদর করে বললেন।

কিশোর চোখ বন্ধ করে শুয়ে ছিল। ওর ঠোঁট কাঁপছে, নিশ্বাসে ছলে উঠছে বুক। নাসারন্ধ্রে কী একটা ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। রজনীগন্ধা না, বেল।

গন্ধময় অস্তিত্বের শ্রোতে যেন ও পদ্মের মত ভাসছে, চেতনা নির্ভার। কিশোরের ঠোঁটে হাসির মুদ্রা খেলে গেল।

বড়বাবু পা দুটো নাচাচ্ছিলেন। তারপর ডাকলেন।

‘অনেকক্ষণ বিশ্রাম করেছ—’ বড়বাবু ওর চুলে হাত বুলোলেন : ‘এবার সুবোধ ছেলের মতন আরম্ভ করো—’

কিশোর হঠাৎ প্রশ্ন করল : ‘আচ্ছা বড়বাবু, মানুষ মরে গেলে কি হয় ?’

বড়বাবু হাসলেন। ‘নশ্বর দেহের মৃত্যু আছে আত্মার তো মৃত্যু নেই।’

‘কালরাত্রে একটা মজার স্বপ্ন দেখলাম—’

‘স্বপ্ন !’

‘হ্যাঁ। আমি মরে গেছি, অথচ আমার বেশ জ্ঞান আছে। দেখলাম কী জানেন, কতকগুলো শুষ্কের আমার চারপাশে ঘোঁত ঘোঁত করছে।’

পুতুল—৪

‘শুয়োঁর !’ বড়বাবু ফ্যা ফ্যা করে হাসলেন। ‘আচ্ছা। এবার কাজের কথায় আসি। বলো তোমার দলের খবর, কারা কারা আছে, কোথায় তাদের অজ্ঞাগার……।’

‘বড়বাবু, চামচিকে কী একটা পাখি না জন্তু ?’

‘অ্যা।’

‘বলতে পারলেন না তো ?’ কিশোর হি হি করে হেসে উঠল।

বড়বাবু এবার গম্ভীর হলেন। ‘তুমি আমার সঙ্গে পরিহাস করছ মনে হয় ?’

‘বড়বাবু জানেন পেঁচা দিনের আলোয় তাকাতে পারে না। কেন জানেন ? গল্প আছে।’

‘আমি গল্প শুনতে চাইনে। আমি যা জানতে চাইছি তুমি তা বলবে কিনা ?’

‘একবার না আমার বোন ছপুরবেলা পায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছিল, আর আমার না এমন হাসি পাচ্ছিল। নীলুটা না এমন ছুঁই।’

‘চালাকি রাখো। তুমি ভেবেছ আমাকে ঠকাবে, কিছুই বলবে না। বেশ। তাহলে জেনে রাখো আমরা সমস্ত খবর বের করে নেবো। ডাক্তার বাবুর হাতে এমন ইনজেকশন আছে যে তোমাকে অচেতন করে তোমারই অজান্তে তোমার মুখ দিয়ে সমস্ত খবর বের করে নেবে। ভেবেছিলাম সেটার দরকার হবে না। প্রস্তুত থেকে। কালই ডাক্তার তোমাকে ইনজেকশনের ব্যবস্থা করবে।’

বড়বাবু রেগেমেগে বেরিয়ে গেলেন।

সারা রাত ঘুম হল না কিশোরের। বিছানায় ছটফট করতে লাগল। ইনজেকশনের ব্যাপারটা তাকে দস্তুর মতন চিন্তিত করছে। সত্যিই যদি তার অচেতন অবস্থায় সে সমস্ত স্বীকারোক্তি করে ফেলে! যতক্ষণ তার জ্ঞান আছে সে কোনো ভয় করে না। কিন্তু অজ্ঞান অবস্থায় সে কী করবে, তার ওপর তো হাত নেই।

জানালায় বাঁটার প্রকাণ্ড হলুদ রঙের চাঁদ।

হাসপাতাল নিঃশব্দ। রাত্রির নার্স বারান্দার টেবিলে বেড়ালের মতন ঝিমোচ্ছে। তার একবার মার কথা মনে পড়ল। মার বড় কষ্ট। ‘মা, মাগো—’ অক্ষুটে উচ্চারণ করল সে।

\* \* \* \*

পরদিন ভোরবেলা ডাক্তারকে নিয়ে বড়বাবু ওর বেডের দিকে এগিয়ে গেলেন।

তারপর হুজনেই বিভীষিকার সামনে স্তব্ধ স্থির হয়ে আটকে গেলেন। একটা চোদ্দ বছরের ছেলে এই বেপরোয়া হুঃসাহস পেল কী করে।

বিছানার শাদা চাদর রক্তে লাল হয়ে ভিজে জবজবে। খাট থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়েছে রক্তের ধারা। আর একরাশ রক্তজবার মাঝখানে একটা বেদীর মতন পড়ে রয়েছে কিশোর। চোখ দুটো খোলা। মুখে জ্যোতির্ময় হাসি।

ডাক্তার বললেন, ‘ছোকরা আপনাকে ফাঁকি দিয়ে পালাল। ও নিজের হাতে কাঁচা ব্যাণ্ডেজটা ছিঁড়ে ফেলেছে। সারারাত শরীরের সমস্ত রক্ত উজাড় করে দিয়েছে।’

বড়বাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগলেন।



শেষ রাত্রেই হস্টেলটাকে ছেকে ফেলেছে সশস্ত্র সিপাহী। বাইরে কুকুরের চিংকার শুনে প্রথম ঘুম ভেঙেছিল রজতের। ঘুম নয়, তন্দ্রা। আজকাল আর নিবিড় ঘুম বলে কিছু নেই। সন্দেহ হয়েছিল রজতের। তারপর নিঃশব্দে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছিল। রাস্তার নিচে চোখ পড়েছিল। কালো গাড়ি। সশস্ত্র সিপাহী। রাইফেল, মেশিন গান। হাতে তারের ঢাল।

কয়েক দিন থেকেই রজত আপত্তি করছিল থানার নাকের সামনে এই হস্টেলটাতে আশ্রয় নেবার বিরুদ্ধে। ওরা কেউ শোনেনি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নোটিশ দিয়ে দিয়েছে হস্টেল খালি করে ছেলেদের চলে যাওয়ার জগে। অনেকে চলে গেছে। তাই প্রায় খালি হস্টেলটায় আস্তানা গড়ার পক্ষে সকলে নিরাপদ ভেবেছে। ভেবেছিল থানার সুরক্ষিত বাহুর মধ্যে আছে, বিপদের আশংকা কম। কৌশলের দিক থেকে এটা সুবিধেজনক। এমন চিন্তা তাদের নিশ্চিত করেছিল।

আজ সকালেই দুজন আত্মগোপনকারীকে এখানে আশ্রয় দিতে হয়েছে। যাদের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট। চার্জ কী? রজত নিজের

মনেই বলল : আজকাল চার্জটা বড় কথা নয়। ছাপানোই রয়েছে, সই করে দিয়ে দিলেই চলবে। সতীনাথকে সেদিন ধরলো না ?

বস্ত্রত রজত এগুলি দ্রুত ভেবে যাচ্ছিল।

আজকের অভিধান যে এই দুজনকে পাকড়াও করাঃ জগে তাতে আর কোনো ভুল নেই।

কিন্তু, ওরা এত তাড়াতাড়ি খবর পেয়ে যাচ্ছে কী করে ! সংগঠনের দুর্বলতার জগেই বুঝি। সূর্য ? হঠাৎ এই মুহূর্তে সূর্যের কথাটাই মনে হল রজতের। ওকে দুদিন লক-আপে আটকে রেখে ছেড়ে দিয়েছে। সূর্য সম্পর্কে কানাঘুষোয় অনেক রূতাস্ত জানা যাচ্ছে।

সূর্য, সূর্য কী ?

হস্টেলকে সংক করতে গিয়ে রজত দেখল ইতিমধ্যেই ওরা উঠে পড়েছে। কয়েকজন ছাদে। সিঁড়িতে চারজন। সদরের কোলাপ্‌সিবল গেট বন্ধ।

রজত ছাদে উঠে এল।

সলিল, দিবোন্দু, বিকাশ।

রজত অস্বাভাবিক বলল : 'আমরা বড় নিশ্চিন্ত ছিলাম।'

দিবোন্দু ওর দিকে তাকিয়ে উত্তর করল না।

বিকাশ বলল : 'মনে হচ্ছে ওরা সহজে ছাড়বে না। যুদ্ধের তোড়জোড় দেখে তাই মনে হচ্ছে।'

'এখন কী করা হবে ?' রজতের জিজ্ঞাসা।

দিবোন্দু বলল : 'কথা হচ্ছে ওদের দুজনকে নিয়ে। ওদের ওপর আক্রোশ তো কম নয়।'

'আমাদেরও কী ছেড়ে কথা বলবে ?' রজত মন্তব্য করল।

'আপাতত ওদের দুজনকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে পারলে...।'

'চারদিকে ওরা ঘির রয়েছে। আশেপাশে অস্ত্র বাড়ির ছাদ

নেই যে টপকে যাওয়া যাবে। পিছনে ওই এঁদো ডোবাটা।  
ওটা সাঁতরে কোন দিক থেকে পালানো যাবে?’

‘তোমরা পালানোই ঠিক করলে?’

‘বোকার মতো কথা বলো না। কতক্ষণ ক্র্যাকার নিয়ে লড়াই  
করবে ওদের সঙ্গে। ওরা গেট ভাঙবে, ওপরে উঠবে। ছাদে  
পৌঁছতেও দেরি করবে না।’

‘আমার মনে হয় সূর্য, সূর্যই।’

‘সূর্য!’

‘হ্যাঁ। সেদিন ওকে পুলিশের ভ্যানে দেখা গেছে।’

‘উপস্থিত এ-খবরটা জেনেও আমাদের কোনো লাভ নেই।’

‘খাচ্ছে। শত্রু-মিত্র ..’

‘তার বিচার পরে হবে।’

দিব্যেন্দু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল : ‘পৌনে চারটে।’

বাইরে অন্ধকারটা পুরু কন্ডলের মতো লেপটে রয়েছে।

রাস্তার ওপারের বাড়িগুলোর জানালাগুলো বন্ধ। কে জানে,  
এতক্ষণ খোলা ছিল কী না।

‘বড় ধারাপ লাগে যখন ভাবি এই নিরাপদ শয্যায় শুয়ে-থাকা  
লোকগুলো আমাদের এই কাজগুলোর কথা একটুও ভাবে না।’

‘কেন ভাববে? সামাজিক পরিবর্তন হলে ওদের বাড়তি  
কী সুবিধা হবে?’

‘কী জানি হয়তো আমরা ওদের সময় মতো বোঝাতে  
পারিনি। ওরাও আমাদের ভয় করে, বিশ্বাস করে না। জানো,  
আমরা ক্রমশ ভ্রাম্যমাণ একটা দলে পরিণত হচ্ছি।’

‘দিব্যেন্দু, তুমি কী ক্লাস্ত?’

‘না ভাই, এত তাড়াতাড়ি ক্লাস্ত হলে চলবে কেন?’

বিকাশ বলল : ‘মনে হচ্ছে আমাদের ডাইনিং-এর একটা  
জানালায় গরাদ খসানো যায়। জানালায় বাইরে নোরো

ঝোপঝাড়। ওই নোংরা মাড়িয়ে ডান দিকে একটা ভাঙা পাঁচিল।’

‘হ্যাঁ ভাঙা পাঁচিল। পাঁচিল টপকে যে নিরাপদ জায়গাটা পাবে সেটা থানার কম্পাউণ্ড।’

‘ওখানে ওদের গ্যারাজ। গ্যারাজটাকে পাশে রেখে নিঃশব্দে সোজা পিছনের গেটটার দিকে হেঁটে আসা যায়। আর সেটা পেরোলেই রাস্তা। এ দিকটায় ওদের পাহারা নেই।’

‘এই, ওরা ছাদের দিকে আমাদের লক্ষ্য করছে।’

‘ওদের লক্ষ্য এদিকে নিবন্ধ রাখবার জগ্গেই এখানে হু একজন থাকে। ভাব দেখাও আমরা একটা কিছু করতে যাচ্ছি। ওরা ঘাবড়াবে। ব্যস্ত থাকবে।’

বিকাশ বলল : ‘আমি ওদের ডাইনিংরুমে নিয়ে যাচ্ছি।’

‘খুব সাবধান।’

সিঁড়ির দিক থেকে আওয়াজ এল : ‘ওরা এগোচ্ছে পজিশন নাও।’

সার সার ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল।

ওরা কী কোলাপসিব্‌ল গেট ভেঙে ফেলবে।

দিব্যান্দু বলল : ‘যতক্ষণ না কমরেডরা নিরাপদে বেরিয়ে যেতে পারছে ততক্ষণ এদের ঠেকাতে হবে।’

রজত আবার বিড় বিড় করে বলল : ‘আমি এখনো বলছি এভাবে চলে না। চলতে পারে না।’

‘কী ভাবে?’

‘শহরের সব শেণ্টারগুলো আমাদের নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমরা ধরা পড়ে যাচ্ছি।’ রজত বলল। ‘সূর্য, সূর্যই।’

‘সূর্যের কথা থাক।’

‘কেন থাকবে? আমরা এখানে কী কাজ করছি কেউ বোঝে না। কেন মরতে যাচ্ছি তাও বোঝে না।’

‘কী করে বুঝবে? কেউ তো আত্মত্যাগ করতে চায় না। নিজের জীবনের মতো প্রিয় আর কী আছে! সবাই ভাবে আমাদের সকলের কাজটা অন্য কেউ করে দিক। আজ বুঝছে না, একদিন বুঝবে।’

‘সেদিন আমরা থাকব না।’

‘মানুষ অমর নয়। আচ্ছা, ওরা কী ডাইনিং-রুম থেকে বেরোতে পেরেছে?’

‘আমি কা দেখব?’

‘দরকার নেই। সংকেত পাব।’

গেটের সামনে উদ্ভূত রাইফেল, মেশিনগান। তারের ঢাল।

ওরা কী এবার আক্রমণ করবে? নাকি আগে সাবধান করবে?

গুলির শব্দ।

‘দেয়ালে স্টেটে দাঁড়াও।’

‘কোথায় গুলি করল?’

‘জানিনে।’

‘কমরেডরা কী ধরা পড়েছে?’

‘মনে হয় না।’

পরপর কয়েকটা ক্র্যাকারের গম্ভীর আওয়াজ।

হাওয়ায় বারুদের গন্ধ।

কোলাপসিবল্ গেটটা ওবা ভাঙছে।

উদ্ভূত রাইফেল, মেশিনগান।

ক্র্যাকার আর গুলির শব্দ একযোগে।

ওরা পিছু হটছে। চিন্তা করছে।

কে ছুটে এসে খবর দিল : ‘এদের ব্যস্ত রাখো। কমরেডরা বাড়ি থেকে নেমে পড়েছে। যেন ওদের দৃষ্টি ঝোপঝাড়ের দিকে না যায়।’

গুলির শব্দ হস্টেলের অভ্যন্তরে প্রতিধ্বনি তুলছে।

এবার সিপাহীরা সিঁড়ির মুখে। সিঁড়িতে গা :

‘চার্জ !’

হুম্ হুম্ হুম্।

আবার ওরা পিছু হটে গেল।

সিঁড়ির ওপরটায় এদের সুবিধে হয়েছে। এমনিতে সিঁড়ির পরিসরও ছোটো। পাশাপাশি কোনো বকমে ছুঁজনে উঠে আসা যায়।

কিন্তু সিপাহীরা অস্ত্রে সুসজ্জিত সবেও সাহস করছে না।

‘সারেগার করো। এইভাবে লড়াই করে তোমাদের পক্ষে সুবিধে হবে না।’ নিচে থেকে অফিসারের চিৎকার।

‘ওরা আমাদের সারেগার করতে এসেছে।’ বজত বিড় বিড় করে বলল।

দিবোন্দু বলল : ‘প্রথমে আক্রমণ করে পরে সারেগার করতে বলা।’

‘আমি আবার বলছি সারেগার করো। আমাদের আরো ফোর্স চেয়ে পাঠিয়েছি। এর পর আর পরিস্থিতি আয়ত্তের মধ্যে থাকবে না।’

‘আপনারা কী চান ? কেন হস্টেলে চড়াও হয়েছেন ?’ দিবোন্দু চিৎকার করে জানতে চাইল।

‘ওদের ছুঁজনকে আমাদের হাতে তুলে দাও।’

‘ছুঁজন ! ওদের ছুঁজনকে আমরা কোথায় পাব ?’

‘চালাকি রাখো। আমাদের ধৈর্যের সীমা আছে।’

‘এখানে আমরা ছাড়া বাইরের কেউ নেই। বাইরের কাউকে আমরা আলাউ করিনে।’

‘ছাখো, শেণ্টার দেওয়াও একটা অপরাধ। তার জগে আইন তোমাদেরও ছাড়বে না।’

‘আমরা কাউকেও শেপটার দিইনি। এই হঃসময়ে কেউ কাউকে শেপটার দেয় না।’

অফিসার ঠাঁকলেন : ‘ফায়ার।’

গুডুম গুডুম গুডুম।

‘চারদিক থেকে সাঁড়াশির মতো চেপে ধরো ওদের। যেন একটা মাছিও পালাতে না পারে।’ অফিসার নির্দেশ দিলেন।

দিবোন্দু গস্তীর গলায় বলল : ‘ওদের আসতে দাও। ওরা সোজা দোতলায় উঠে আসবে। সিঁড়িতে যারা আছো কার্নিশ বেয়ে দরোয়ানের ঘরের দিকে টুপটাপ লাফিয়ে পড়ো। ওরা মনে করবে আমরা দোতলা ছেড়ে তিনতলায় ছুটে গেছি। ওদিকে ধাওয়া করবে। সেই অবকাশে যে যেদিকে পারো ছড়িয়ে যাও।’

‘কিন্তু ছাদের ওরা?’

‘ওরা এতক্ষণ দড়ি ঝুলিয়ে ডোবায় নেমে পড়েছে। ও কি, ডোবার দিক থেকে ফায়ারিং-এর শব্দ?’

সঙিন উঁচিয়ে ঢাল হাতে সিপাহীরা বেগে সিঁড়ি ডিঙিয়ে তেতলায় হুড়মুড় করে উঠে পড়ল।

দরোয়ানের ঘরে এরা নিঃশব্দে প্রহর গুনছে।

অফিসাবের সামনে কাকে হিঁচড়ে নিয়ে আসছে।

ফিশফিশ করে নবীন বলল : ‘শ্যামল...।’

রজ্জত বলল : ‘ওকে ওবা খুব মেবেছে।’

‘হ্যাঁ, ধরা পড়লে আমাদেরও মারবে। প্রথম ছু’ একবার লাগবে। তারপর আর বোধ থাকবে না।’

রজ্জত বলল : ‘আমি কোনোদিন মার খাইনি কি না।’

‘যেন আমরা মার খেতে জন্মেছি।’

‘না, তা নয়।’

‘কাঁপছিস কেন?’

‘শীত শীত করছে। দেখো, ঠিক হয়ে যাবে।’

‘কমরেডরা দিব্যি পার হয়ে যেতে পেরেছে।’

সিঁড়ি বেয়ে সিপাহীরা এবার নিচে নামছে। এদিক ওদিক সন্ধানী দৃষ্টি।

ওরা কী দরোয়ানের ঘরের দিকে আসবে ?

সিপাহীরা নিরাশ হয়ে অফিসারকে রিপোর্ট করল।

অফিসার কর্কশ গলায় বললেন : ‘ওরা কী পাখি যে উড়ে পালাবে ?’

‘না সার, ছাদে কেউ নেই। দোতলা তিনতলা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি।’

‘অণু কোথা দিয়ে পালালে বাইরে সান্দ্রীরা ছিল তারা কী করেছে ? এই—এই—’ বুটের ঠোকর মারলেন অফিসার।

শ্যামল মুখ গুঁজে পড়ে রইল।

‘বলো ওরা কোথায় ? চুপ করে থাকো না। জবাব দাও।’ অফিসার রাগে কাঁপতে লাগলেন।

রক্তত ফিশফিশ করে বলল : ‘ওকে লাথি মারছে। আমার বাবা বলতেন মানুষকে লাথি মারা অণ্ডায়।’

‘তোর ইস্কুল মাস্টার বাবা নীতিকথার বাইরে যেতে পারেননি।’

‘কী নাম তোর ?’ অফিসারের গর্জন।

‘ছাখো ওকে গালাগালি করছে।’

‘গালাগালির ব্যাপারে তোর বাবা কী বলতেন ?’

‘বলতেন...’

‘আহ্ !’

‘ছাখো শ্যামলের পায়ের ওপর বুটপায়ে দাঁড়িয়ে লাফাচ্ছে—’

‘আমি হলে সহ্য করতে পারতাম না...।’ রক্তত বলল।

‘বল শালা ওরা কোথায় পালিয়েছে ?’

‘সার, বাইরে কিসের শব্দ ?’ সিপাহী বলল।

বাইরে থেকে সান্দ্রী ছুটে এল।

‘সার, একটা প্রকাণ্ড মিছিল এগিয়ে আসছে।’

‘মিছিল!’

‘হাঁ সার, মনে হচ্ছে এলাকার মানুষ। ছাত্ররাই এগিয়ে নিয়ে আসছে ওদের।’

অফিসার গेट থেকে বেরিয়ে রাস্তার দিকে ধাবিত হলেন।

নবনৌ বলল : ‘কমরেডরাই মিছিলকে টেনে নিয়ে আসছে। পাড়ায় গিয়ে ওরাই খবর দিয়েছে।’

রজত বলল : ‘তুমি কি করে জানলে?’

‘আমাদের অবস্থাটা তো ওরা দেখে গেছে। আমাদের উদ্ধার করবার জন্যে ওদেরও তো কিছু করতে হবে। ছাখো হস্টেলের খারটা ফাঁকা হয়ে গেছে। সিপাহীরা খানার দিকে হেঁটে যাচ্ছে।’

‘আমরা কী এখন বেরোব?’

‘না। মিছিল আসুক। ওদের মধ্যে মিশে যেতে হবে।’

হস্টেলের সামনেটা উপছে উঠছে মানুষের ভিড়ে। ওরা কী হাত তুলে শ্লোগান দিচ্ছে?

রজত বলল : ‘সিপাহীরা ফিরে গেল কেন?’

ওর জিজ্ঞাসার কেউ উত্তর দিল না।

শ্যামলের আহত দেহটাকে কারা তুলে নিল।

আবার শ্লোগান।

দরোয়ানের ঘর থেকে বেরিয়ে এল ওরা। প্রবল জনশ্রোত ওদেরও তুলে নিয়ে চলল। খানার এলাকা ছাড়িয়ে, দূরে, অনেক দূরে।